দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

আত্মবিস্মৃত হিন্দু বাঙালিরা কি ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেবে না?
— পৃঃ ১৫

বন্দে মাতরমের অঙ্গচ্ছেদ এবং দেশমাতৃকার বিভাজন
— পৃঃ ২৩

৭০ বর্ষ, ৫১ সংখ্যা।। ১৩ আগস্ট ২০১৮।। ২৭ শ্রাবণ - ১৪২৫।। যুগাব্দ ৫১২০।। পনেরো আগস্ট বিশেষ সংখ্যা।। website : www.eswastika.com

বন্দেমাতরম্

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

পনেরো আগস্ট বিশেষ সংখ্যা

৭০ বর্ষ ৫১ সংখ্যা, ২৭ শ্রাবণ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

১৩ আগস্ট - ২০১৮, যুগাব্দ - ৫১২০,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

প্রশাসনিক ব্যর্থতা আড়াল করতে নেত্রী সস্তার রাজনীতি করছেন □ গূঢ়পুরুষ □ ৬

খোলা চিঠি : অসমের নাগরিকপঞ্জি নিয়ে মমতা কেন ক্ষিপ্ত □ সুন্দর মৌলিক □ ৭

দেশে শরিয়া আদালতের কোনও স্থান নেই □ সাজিয়া ইলমি □ ৮

গান্ধীজীর সম্মতি ও উপস্থিতিতেই ভারতভূমি দ্বিখণ্ডিত হয়েছে □ ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত □ ১১

ভারতের স্বাধীনতা দিবস আনন্দে-বিষাদে ভরা □ মণীন্দ্র সাহা □ ১৩

আত্মবিস্মৃত হিন্দু বাঙালিরা কি ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেবে না? □ প্রণব দত্ত মজুমদার □ ১৫

বাংলা সম্বন্ধে গোখলের মন্তব্য এখন উপহাস মাত্র □ কে এন মণ্ডল □ ১৭

বন্দে মাতরমের অঙ্গচ্ছেদ এবং দেশমাতৃকার বিভাজন □ তুষারকান্তি ঘোষ □ ২৩

জীবন মরণের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে হিন্দু-ভারত □ প্রীতীশ তালুকদার □ ৩০

মানবতাবাদী, বিপ্লবী ও মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দ □ আশিস রায় □ ৩১

শিল্প ভাবনায় শিং এবং দাঁত □ চূড়ামণি হাটি □ ৩৩

গল্প : ভাগ্যবানের গপ্পো □ হিমাদ্রি দাস □ ৩৫

ইনসলভেন্সি রোড ও ব্যাঙ্ক-ঋণখেলাপিরা □ সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় □ ৪৩

নিয়মিত বিভাগ

উবাচ : ১০ □ **চিঠিপত্র : ১৯-২০** □ **অঙ্গনা : ২১** □

সুস্বাস্থ্য: ২২ □ **নবাঙ্কুর : ৩৮-৩৯** □ **চিত্রকথা : ৪০** □

খেলা : ৪১ □ **অন্যরকম : ৪২** □ **স্মরণে : ৪৫** □

পুস্তক প্রসঙ্গ : ৪৯ □ **সাপ্তাহিক রাশিফল : ৫০**

প্রকাশিত হবে
২০ আগস্ট, '১৮

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
২০ আগস্ট '১৮

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

মমতার এন আর সি-বিরোধিতা কি ভোটব্যাঙ্ক বাঁচানোর তাগিদ

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আগে দল তারপর দেশ। ২০০৫ সালে তিনি বিদেশি অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়িত করার পক্ষে ছিলেন। কারণ তখন রাজ্যে ক্ষমতায় ছিল সি পি এম। আর এই অনুপ্রবেশকারীরা ছিল সিপিএমের বড় ভোটব্যাঙ্ক। কিন্তু এখন পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। এখন রাজ্যের ক্ষমতায় রয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল। আর সেই অনুপ্রবেশকারীরাই এখন তাদের ক্ষমতায় টিকে থাকার প্রধান হাতিয়ার। তাই অসমে নাগরিকপঞ্জি তৈরি হবার পর অন্য সুরে কথা বলছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ভোটব্যাঙ্ক সুরক্ষিত রাখতেই অসমের নাগরিক পঞ্জিকরণের বিরোধিতা করছেন তিনি। মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন 'বাঙালি'দের তাড়ানো হচ্ছে বলে। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় থাকবে এই বিরোধিতার ক্ষুরধার বিশ্লেষণ। লিখবেন রন্তিদেব সেনগুপ্ত, মোহিত রায় এবং জিষ্ণু বসু।

।। দাম একই থাকছে— দশ টাকা মাত্র।।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name :
United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

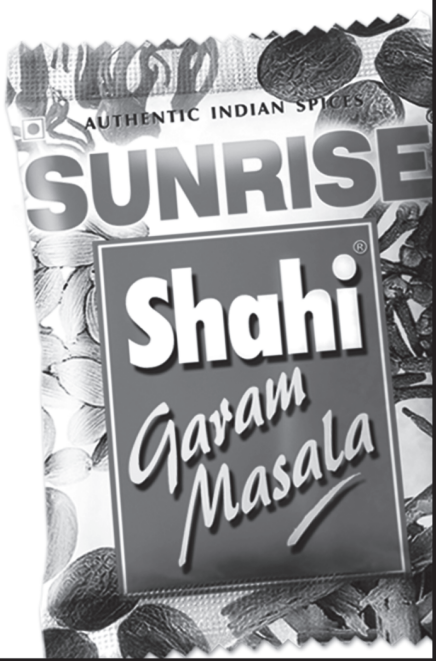

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি এইদেশে অনুপ্রবেশকারীদের ঠাঁই দিতে চাহিতেছেন?

অসমে এন আর সি পরবর্তী পরিস্থিতি তদন্ত করিবার জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের আট সদস্যের এক প্রতিনিধি দল শিলচরে গিয়াছিলেন। শিলচর বিমান বন্দরে সেই প্রতিনিধি দলের হুংকার শেষ হয় নাটকবাজিতেই। নিজেদের মুখ রক্ষা করিতে পুলিশি 'আতিশয্য'-এর অভিযোগ তুলিয়া পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল দুইদিন ব্যাপী 'কালাদিবস' পালন করিয়াছে। তৃণমূল সুপ্রিমো তথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অসমে এন আর সি খসড়া প্রকাশের তীব্র বিরোধিতা করিয়া বলিয়াছেন, দেশের ৪০ লক্ষ মানুষকে রাতারাতি উদ্বাস্তু করিয়া দেওয়া হইল। ইহাদের বহিষ্কার করিলে গৃহযুদ্ধ বাঁধিবে বলিয়া হুংকার দিয়াছেন। কিন্তু ঘটনা হইল, যতই দিন যাইতেছে ততই জাতীয় রাজনীতিতে এন আর সি ইস্যুতে তৃণমূল কার্যত একঘরে হইয়া পড়িতেছে। শিলচর কাণ্ডের পর স্বয়ং অসমের তৃণমূল সভাপতি দীপেন পাঠক-সহ বেশ কয়েকজন নেতা দল হইতে পদত্যাগ করিয়াছেন। অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ জানাইয়াছেন যে, অসমের মানুষের ভালোমন্দটা তাহারাই দেখিবেন। অকারণে রাজনীতি করিয়া অসমের শান্ত পরিস্থিতি অশান্ত করিবার চেষ্টা হইতেছে। কংগ্রেসের রাজ্যসভার দল নেতা গুলাম নবি আজাদও মনে করেন যে, দেশের নিরাপত্তা, ভৌগোলিক অখণ্ডতার প্রশ্নে সমঝোতা নয়। তাই দেশের কাছে এমন একটা তালিকা থাকা প্রয়োজন।

২০০৫ সালে সংসদে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হইয়াছিলেন। আজ ১৩ বৎসর পর সেই তিনিই 'ইউটার্ন' করিয়া অনুপ্রবেশকারীদের পক্ষে গলা ফাটাইতেছেন। তাঁহার এই দ্বিচারিতাকে 'কুর্সিদিদি' বলিয়া যে কটাক্ষ করা হইয়াছে, তাহা অসঙ্গত নয়। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সীমান্তবর্তী অসমে অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের এন আর সি-র মাধ্যমে চিহ্নিত করা হইতেছে। তাই প্রশ্ন উঠিতেই পারে, এন আর সি ইস্যুতে যাহারা বিরোধিতা করিতেছে তাহারা কি অনুপ্রবেশকারীদের এই দেশে ঠাঁই দিতে চাহিতেছেন? উল্লেখ্য, এন আর সি-র পক্ষ হইতে তথ্য যাচাইয়ের জন্য যতজনের নাম পাঠানো হইয়াছিল, তাহার মধ্যে এক লক্ষের ওপর মানুষের তথ্য পাঠায় নাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার।

বস্তুত সমগ্র দেশের সব রাজ্যেই রাষ্ট্রীয় নাগরিকপঞ্জি হওয়া দরকার। আমাদের জানা দরকার যে কে দেশের প্রকৃত নাগরিক আর কে নয়। আমাদের দেশটা কোনও ধর্মশালা নহে। বাইরের দেশ হইতে মানুষ এই দেশে আসিতেছে; ভিসার মেয়াদ শেষ হইয়া যাইলেও ভারত ছাড়িয়া যাইতেছে না। ইহা চলিতে পারে না। অন্যতম সীমান্তবর্তী রাজ্য হিসাবে এই সমস্যাটা অসমে বেশি। পশ্চিমবঙ্গেও অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা কোটি ছাড়াইয়া যাইবে। অসম ও পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশ লইয়া বহু বৎসর ধরিয়া আলোচনা চলিতেছে। ইতিপূর্বে অনুপ্রবেশকারীদের সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধী, ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, জ্যোতি বসু প্রমুখ। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিংহ-ও পশ্চিমবঙ্গে এন আর সি করা হইবে কিনা, তাহা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের বিবেচনাধীন বলিয়া জানাইয়াছেন। আসলে তৃণমূল সুপ্রিমো ভয় পাইতেছেন, কেননা পশ্চিমবঙ্গে এন আর সি চালু হইলে ৩১ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্ক নষ্ট হইয়া যাইবার আশংকা রহিয়াছে। ঝোলা হইতে বিড়াল বাহির হইবার ভয়ে তিনি হইচই শুরু করিয়াছেন। দেশভাগ সমর্থন করিয়া যাঁহারা পাকিস্তানে গিয়াছিলেন, তাঁহারাই আজ এই দেশকে আবার দখল করিবার জন্য অবৈধ অনুপ্রবেশের মধ্য দিয়া ফিরিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি মালদা জেলায় ১৭ জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে যাহারা বাংলাদেশ হইতে অনুপ্রবেশ করিয়াছে। অনুপ্রবেশের বিষয়টি তাই জাতীয় স্বার্থে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাহাদের বিরুদ্ধেই যে এন আর সি—তৃণমূল সুপ্রিমো এই কথাগুলি বলিতেছেন না। ভোটের স্বার্থে অনুপ্রবেশকারীদের তোল্লাই দিতেছেন।

সুভাষিতম্

দোষোঽপ্যস্তি গুণোঽপ্যস্তি সামান্যেঽপি বস্তুষু।
সুকুমারস্য পদ্মস্য নালো ভবতি কর্কশঃ।। (চাণক্য নীতি)

পদ্ম অতি সুকোমল হলেও তার যেমন কণ্টকময় নাল থাকে। সেইরূপ বস্তুমাত্রেই দোষ ও গুণ দুই-ই থাকে।

প্রশাসনিক ব্যর্থতা আড়াল করতে নেত্রী সস্তার রাজনীতি করছেন

অসমে নাগরিক পঞ্জিকরণ তালিকা থেকে প্রায় চল্লিশ লক্ষ মানুষকে রাতারাতি অনুপ্রবেশকারী বানিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি প্রচার করছেন যে, অসমে বিজেপি সরকার এবং কেন্দ্রের মোদী সরকার যুক্তভাবে সেখানে সাম্প্রদায়িক বিভাজন শুরু করেছে। তৃণমূলের সাংসদরা অসমের শিলচরে বরাক উপত্যকার বাঙালি মুসলমানদের উস্কানি দিতে যান। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য সফল হয়নি। বিমানবন্দরেই পুলিশ তৃণমূল সাংসদদের আটকে দেয় এবং পরের ফিরতি বিমানে কলকাতায় পাঠিয়ে দেয়। জবাবে কলকাতার পথে তৃণমূলিরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কুশপুতুল পোড়ায় এবং রেল অবরোধ করে রাজ্যের জনজীবন অচল করে, শক্তি প্রদর্শন করে, নেত্রীর 'গুস্‌সা' ঠাণ্ডা করে। অনেকেরই মনে আছে যে, রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর নেত্রী ঘোষণা করেছিলেন তাঁর দল রেল ও সড়ক অবরোধ করে জনজীবন অচল করার বিরোধী। বাস্তবে আমরা দেখছি যে, লোকসভার নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে নেত্রী হিন্দু-মুসলমান, বাঙ্গালি-বিহারি বিভাজনের অভিযোগ তুলে হাওয়া গরম করার চেষ্টায় আছেন। রোজই বলছেন, অসমে বিজেপি নাগরিক পঞ্জিকরণের নামে বাঙালি খেদাও-এর ষড়যন্ত্র করছে। আর নেত্রীকে সাহায্য করছে কলকাতার সংবাদপত্রগুলি।

কলকাতা সংবাদমাধ্যম একবারও বলছে না যে, অসমে নাগরিক পঞ্জিকরণের কাজটি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে করা হচ্ছে। কেন্দ্রে কংগ্রেসের ইউপিএ সরকারের আমলে শীর্ষ আদালতের নির্দেশিত পঞ্জিকরণ জোরদার ভাবে শুরু হয়। সম্প্রতি বিজেপির এনডিএ সরকারের আমলে পঞ্জিকরণের খসড়া তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। তালিকায় ভুল-ত্রুটি থাকলে নাগরিকদের দু'মাস সময় দেওয়া হয়েছে ত্রুটি সংশোধনের জন্য তথ্য-সহ আবেদন জানানোর। আবার বলছি, সবই হয়েছে শীর্ষ আদালতের নির্দেশে। কংগ্রেস হাইকম্যান্ডের মুখপাত্র রণদীপ সুরজেওয়ালা দাবি করেছেন নাগরিক পঞ্জিকরণের কাজ মনমোহন সিংহ সরকারের আমলেই ৮০ শতাংশ সারা হয়ে যায়। মোদী সরকারের আমলে মাত্র ২০ শতাংশ কাজ করেই মমতার প্রচারের দৌলতে রাজনৈতিক ফায়দা বিজেপি ঘরে তুলছে। যদিও কাজের এই শতাংশের হিসাব নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে।

গূঢ়পুরুষের কলম

তৃণমূল নেত্রীর চূড়ান্ত উস্কানি সত্ত্বেও অসম শান্ত। বরাক ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার কোথাও কোনও সাম্প্রদায়িক অশান্তির খবর এই প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত নেই। তবে তৃণমূলনেত্রীর ভূমিকায় সিঁদুরে মেঘ দেখছেন অসমের বাঙালিরা। মমতার নিন্দায় সরব অসমের বিভিন্ন দল ও সংগঠন। রাজনীতি ভুলে সেখানকার সমস্ত দল একত্রে প্রশ্ন তুলেছে। পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দারা যাঁরা কর্মসূত্রে অথবা বিবাহসূত্রে অসমে বসবাস করছেন তাঁদের নাগরিকত্ব সম্পর্কে আবদনপত্রে দেওয়া তথ্য যাচাইয়ের জন্য ২০১৫ সালে ১লক্ষ ২০ হাজার পশ্চিমবঙ্গবাসীর তথ্যপঞ্জি রাজ্য সরকারের কাছে এন আর সি কর্তৃপক্ষ পাঠায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বা মমতা সরকার পাঠানো নথির মধ্যে মাত্র ১৫ হাজার নথি যাচাইয়ের পর ফেরত পাঠায়। স্বাভাবিক ভাবেই এন আর সি কর্তৃপক্ষ বাকি ১লক্ষ ৫ হাজার পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি আবেদনকারীর নাম খসড়া তালিকা থেকে বাদ দিয়েছে। অসত্য প্রচারে সুদক্ষ তৃণমূলনেত্রী সাফাই দিচ্ছেন, ''সবৈব মিথ্যা কথা। আমাদের কাছে পাঠানো হয়নি''। যদি সবই মিথ্যা হয় তবে ১৫ হাজার মানুষের তথ্যপঞ্জী যাচাই করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সিলমোহর দিয়ে এন আর সি দপ্তরে ফেরত গেল কীভাবে? সেই ২০১৫ সালেই জেলা শাসকরা স্বরাষ্ট্র সচিবকে জানিয়েছিলেন যে, লোকাভাবে তথ্য যাচাইয়ের কাজ করা যাচ্ছে না। আর এখন দিদি বলছেন যে, তিনি কিছুই জানেন না। তিনি কিছু জানেন না বলে আদতে পশ্চিমবঙ্গবাসী লক্ষাধিক মানুষ অসমে অনুপ্রবেশকারী বলে চিহ্নিত হয়েছেন। শুধু কন্যাশ্রী, রূপশ্রী প্রকল্প দিয়ে অকর্মণ্যতা অপদার্থতা ঢাকা দেওয়া যায় না— এই সত্যটি সবাইকে বুঝতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের নাম বাদ পড়ার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসনকে কাঠগড়ায় তুলেছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস দলনেতা দেবব্রত শইকিয়া। তিনি প্রয়াত হিতেশ্বর শইকিয়ার ছেলে। দেবব্রতবাবু মমতার নিন্দা করে বলেছেন,'' রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এখন বাঙালিপ্রীতি না দেখিয়ে অসমের বাঙালিদের নাম যাতে বাদ না পড়ে তার জন্য নথি যাচাইয়ের বিশেষ বিভাগ তৈরি করে দিতে পারতেন তিনি। কিছুই না করে এখন তিনি অসমীয়, বাঙালি বিভাজনে মদত দিচ্ছেন। প্রাক্তন কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ বলেছেন, ''মমতার অসম নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। যেসব বাঙালি, অসমীয়, বিহারি, নেপালি হিন্দু-মুসলমানের নাম বাদ পড়েছে তাদের হয়ে অসমের মানুষ লড়াই করবে। বাইরের কারও তা নিয়ে রাজনীতি করার দরকার নেই।'' অসম চুক্তির অন্যতম রূপকার অগপ নেতা প্রফুল্ল মহন্তের বক্তব্য,'' তৃণমূল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অসমের স্বার্থ বিঘ্নিত করছে।'' অসমের অর্থমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা বলেছেন,'' খামোকা আমাদের রাজ্যে অশান্তি না করে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশিত প্রক্রিয়ায় কোনও আপত্তি থাকলে আদালতে যান। রাজ্যে কোথাও অশান্তি নেই। খসড়া তালিকায় যাদের নাম বাদ পড়েছে তারা আন্দোলন না করে বরং আবেদন করতে তৈরি হচ্ছেন। এখানে মিথ্যে অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা না করাই ভালো।'' গূঢ়পুরুষের বক্তব্য ঠিক এটাই। দয়া করে অসমের বাঙালিদের বিপদে ফেলবেন না। বরং রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিবকে প্রশ্ন করুন, এন আর সি-র পাঠানো নথি যাচাই যথাসময়ে করা হয়নি কেন?

এত বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মুখ্যমন্ত্রীকে জানানো হয়নি কেন? মিথ্যা ওজর দিয়ে সত্যকে আড়াল করা যায় না। ■

অসমের নাগরিকপঞ্জি নিয়ে মমতা কেন ক্ষিপ্ত

মাননীয় পাঠক-পাঠিকা,

ধর্ম নিয়ে রাজনীতি। আর এ নিয়ে রাজনীতি করায় মূল অভিযুক্ত বিজেপি। কিন্তু রাজনীতির ইতিহাস সম্পর্কে যাঁরা সচেতন তাঁরা জানেন, এই পশ্চিমবঙ্গে 'ধর্ম-রাজনীতি' নতুন কিছু নয়। আর তাতে বিজেপি নয়, মূল তৃণমূল কংগ্রেস, সিপিএম তারাই বেশি পারদর্শিতা দেখিয়েছে। দেশভাগের আগে থেকে আজ পর্যন্ত বার বারই সেই রাজনীতি সামনে এনে দিয়েছে নানা অশান্তি।

কিন্তু অসমের ঘটনায় এত ক্ষিপ্ত কেন তৃণমূল কংগ্রেস। রাজ্য বিজেপি বলছে, রাজ্যে ক্ষমতায় এলে পশ্চিমবঙ্গেও নাগরিকপঞ্জি তৈরি করে বিদেশিদের চিহ্নিত করা হবে। তাড়ানো হবে দেশ থেকে। এতে মমতার এত রাগ কেন?

এর সোজা এবং একমাত্র উত্তর— সামনেই লোকসভা নির্বাচন। আর সেই নির্বাচনে রাজ্যে ক্রমশ প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী দল হতে চলা বিজেপির গায়ে আরও বেশি করে 'সাম্প্রদায়িক' তকমা সেঁটে দেওয়াই লক্ষ্য তৃণমূলনেত্রীর।

অন্য দিক থেকে আবার এটাই 'দেশপ্রেমী' তকমা দিচ্ছে বিজেপিকে। বিজেপি জানে যে, 'সাম্প্রদায়িক' তকমা থেকে মুক্তি নেই তাদের। তাই সেই তকমাকেই কাজে লাগাতে চায় বিজেপি। প্রথমে রামনবমী, হনুমান জয়ন্তী পালন করে তৃণমূল কংগ্রেসকে নিজেদের লাইনে হাঁটিয়েছে বিজেপি। তৃণমূল কংগ্রেসের ভূমিকা এক কথায় অনুসরণকারীর। তৃণমূল কংগ্রেসকে 'আমরাও হিন্দু' বলে দাবি করতে বাধ্য করেছে হিন্দুত্ববাদীরা।

অসম ইস্যুতে ইতিমধ্যে অলআউট নেমে পড়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এতে সুবিধা বিজেপিরই। মনে রাখতে হবে, যতই মুসলমান ভোটব্যাঙ্কের ওপর নির্ভরতা থাকুক না কেন সংখ্যাগুরু হিন্দু ভোটের দৌলতেই ক্ষমতায় মমতা। মমতা এবার সেই হিন্দুভোটকেই হারানোর ভয় পাচ্ছেন না তো? তবে বিদেশি মুসলমান ভোটারদের জন্য এত মায়া কেন?

বামেদের বিরুদ্ধে 'তোষণনীতি'-র অভিযোগে এক সময়ে বঙ্গ রাজনীতির অঙ্গন উত্তপ্ত করেছেন মমতা। এখন সেই অস্ত্রই মমতার বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে উদ্যত হতে পারে বিজেপি। ১৯৯৩ সালের ২১ জুলাই রাজ্য যুব কংগ্রেস সভানেত্রী সচিত্র পরিচয়পত্রের দাবিতে মহাকরণ অভিযান করেছিলেন। পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয়েছিল ১৫ জনের। এখন সেই 'একুশে স্মরণ' তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান পরব। সেটাকেই অস্ত্র করতে পাতে বিজেপি। কারণ, সেই সময়ে যুব কংগ্রেসনেত্রী মমতার অভিযোগ ছিল, অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশিদের ভোটার লিস্টে নাম ঢুকিয়ে ফায়দা লুটছে সিপিএম। সে কারণেই তিনি সচিত্র পরিচয়পত্র চালুর দাবি তুলেছিলেন।

আরও অস্ত্র রয়েছে। এনডিএ শরিক থাকার সময় তৃণমূল কংগ্রেসনেত্রী রাজ্যে অনুপ্রবেশ সমস্যা নিয়ে সরব হয়েছিলেন লোকসভায়। এখন বিজেপি সেই ভূমিকা নিয়ে মমতা জমানায় অনুপ্রবেশকে ইস্যু করতেই পারে। এবং করবেও। সহজ প্রশ্ন— দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগের পরেও পূর্ব বা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসা মুসলমানদের কেন ভারতভূমিতে মেনে নিতে হবে? বিশেষ করে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ আলাদা রাষ্ট্রের স্বীকৃতি পাওয়ার পরেও।

অসমে নাগরিকপঞ্জির বিরুদ্ধে যাঁরা সমালোচনার ঝড় তুলেছেন তাঁরা এটা জানেন যে, এমন পঞ্জি রাষ্ট্রের পক্ষে সত্যিই প্রয়োজনীয়। বিরোধীদল কংগ্রেস যখন শাসকের ভূমিকায় ছিল, তখন থেকেই এমন পঞ্জির কথা ভাবা হয়েছে। কারণ, বিপুল পরিমাণ বিদেশি নাগরিকের সংখ্যা যে কোনও দেশের কাছে সামাজিক, অর্থনৈতিক, এমনকী রাজনৈতিক করণেও বিপদের। এর ওপরে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা যদি লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকে, তবে তো সংকট অনেক বড়ো।

এই সত্য জানেন মমতা। আবার এটাও জানেন যে, সামনে লোকসভা নির্বাচন। এই সময়ে বিরোধীদের বিরোধিতা করাই রাজনীতির ধর্ম। তাছাড়া 'প্রেম' বলেও একটা কথা আছে নাকি। আর সে প্রেম আবার অন্ধ।

—সুন্দর মৌলিক

দেশে শরিয়া আদালতের কোনও স্থান নেই

অতিথি কলম

সাজিয়া ইলমি

সংবিধানে চিহ্নিত মূল্যবোধই মুসলমান মেয়েদের জন্য আইনের ভিত্তি। মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ডের সেখানে কোনও ভূমিকা নেই। নির্ভয়া বা খুব সম্প্রতি কাটুয়া কাণ্ড আমাদের যৌথ বিবেকের গোড়া ধরে নাড়া দিয়ে গিয়েছিল। আর সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু একই চরিত্রের এমনই কিছু কুখ্যাত ঘটনা আবারও যখন ঘটে যায়, তখন আমাদের নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক গণ্ডির মধ্যে বা স্বনির্বাচিত সীমানার অভ্যন্তরে থাকার অভ্যাসের ফলে আমাদের সেই বিবেক আর সাড়া দেয় না।

স্মরণ করা যায় বেরেলির এক মহিলাকে তার স্বামী 'নিকা হালাল'-এর বিধান দেয়। এই বিধানের ফলে মহিলার শ্বশুর ও তাঁর দেওর তাকে বারংবার নৃশংস ধর্ষণ করে। এ সবই তিন তালাক ও নিকা হালালের ছত্রছায়ায় অবলীলায় ঘটে যায়। হ্যাঁ, এই ঘটনা ২০০৫ সালের। প্রাথমিক ভাবে মহিলার শ্বশুর তাকে ধর্ষণ করার ফলে দেওবন্দ সেমিনারির নিয়ম মেনে চলা

এই আইনের আওতায় হাত পা কেটে নেওয়া বা মুণ্ডচ্ছেদের কথা চিন্তা করলে এক বর্বর যুগের আতঙ্ক কি মনে আসে না? শরিয়া আইনে সুদ নেওয়া হারাম। আজ কত জন তাদের ব্যাঙ্কে সঞ্চিত অর্থের সুদ ছেড়ে দিতে রাজি? প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় অন্য ধর্মের বহু রীতি যা ইতিমধ্যেই স্বভাবগত হয়ে গেছে তাকে পরিহার করতে কতজন সত্যিই প্রস্তুত?

স্বামীর কাছে ইমরানা 'হারাম' হয়ে পড়ায় একই সঙ্গে সে পরিত্যজ্যও হয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে এই মহান ধর্ম অনুযায়ী শ্বশুর ও স্বামীর তাকে অকাতরে ধর্ষণ করার অধিকার বর্তায়। এসব কর্মই ইসলামের আদেশ অনুযায়ী বলেই মান্য হয়।

এর মধ্যে সবচেয়ে বিসদৃশ ও চিন্তাজনক পরিস্থিতি যা উঠে আসে তা হলো এমন একটা কদর্য ঘটনাকে কী অনায়াসে আমরা হজম করে নিয়েছিলাম কেবলমাত্র নির্দিষ্ট ধর্মীয় সম্প্রদায় হওয়ার কারণে। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন মোল্লা ও ছদ্ম ইসলাম ভক্তরা ধর্মের নামে এমন একটা বীভৎস কামকে মান্যতা দিতে নানান কুযুক্তির আশ্রয় নিতেও দ্বিধা করেনি।

দুঃখের বিষয়, কোরানের সবচেয়ে দীর্ঘতম যে অধ্যায় অর্থাৎ 'সুরা বকরা'র প্রাথমিক পাঠ নিলেই পরিষ্কার হয়ে যায়, যে 'তালাক এ বিদ্দাত' (তিন তালাক) হতভাগ্য স্ত্রীর ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয় কোরানে তার অনুমোদন আদৌ নেই। বরং স্বামী স্ত্রী যদি বিচ্ছিন্নও (তালাকের মাধ্যমে) হয়ে যায় সেক্ষেত্রেও স্ত্রী মনে করলে শুধু মাত্র আবার একবার 'নিকা' কবুল করে তার পূর্বতন স্বামীকে বিয়ে করতে পারে।

অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনকভাবে কোরানের এই অপব্যাখ্যা আজ গেঁড়ে বসেছে। মৌলবি ও মোল্লাদের বিবেক অসাড় হওয়া শুধু নয় তাদের বক্তব্যের মধ্যেও এর প্রভূত সমর্থন পাওয়া যায়। যাতে এটি অনড় একটি অপরিবর্তনীয় নিয়ম হিসেবে টিঁকে থাকে। শিক্ষিত ধনবান ও জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত মুসলমানরাও যদি কোনও ক্রমে ঘুণাক্ষরেও টের পান যে অমুককে তিন তালাক দেওয়া হয়েছে, তাঁরাও হাতে পাঁজি মঙ্গলবার বলে সেই জুড়িকে তুরন্ত আলাদা করতে ছোটেন কেননা স্ত্রী হারাম হয়ে গেছে। অথচ এই কাজ কোরান ও ইসলামের সরাসরি বিরোধী।

এই ধরনের তালাকের ক্ষেত্রে কোরানের নির্দেশকে অমান্য করাই এখন রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমাজের শিক্ষিত ও আপাতভাবে পরিশীলিত কোরানের অনুশাসনগুলিরও অবমাননা করছে। এটি পক্ষান্তরে কোরানের ভিত্তি ও তার সারাৎসারকেই আক্ষরিক অর্থে হত্যা করা। এর পর তো মোল্লা নামের শকুনিরা অপেক্ষমান রয়েইছে। অনেকেরই হয়তো জানা নেই যে আমরা মুসলমান সমাজের মেয়েরা ইতিমধ্যেই কিছুটা মানসিকভাবে রোগগ্রস্ত হয়ে পড়েছি যখন থেকে শুনছি নিদা খানের ওপর প্রতিহিংসার খবর। যখন থেকে নিদা তিন তালাকের বিরুদ্ধে আওয়াজ উঠিয়েছেন, প্রচার শুরু করেছেন, তখনই 'শহর ইমাম মুফতি খুরশিদ আলম' তার বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করেছেন। এই ফতোয়া মোতাবেক তিনি মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকজনকে নিদা অসুস্থ হয়ে পড়লেও তাকে ওষুধ বিক্রি করতে বারণ করেছেন। কী অপরিসীম নিষ্ঠুরতায় ফতোয়া দিয়েছেন তার জানাজায় (শোক মিছিল) কেউ যেন অংশ না নেয়! তার জন্য অন্তিম নামাজ নিষিদ্ধ করে নিদার কবরের জন্য জমিও অস্বীকার করার ফতোয়া দেওয়া হয়েছে।

যদি নিজে চোখে দেখে না থাকেন তাহলে শুনুন— কুখ্যাত মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড (এ আই এম পি এল বি) দেশের অভ্যন্তরে শরিয়া আদালত বসাবার জন্য হুংকার ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রতিনিধি মুফতি আজিজ কাজমির মতো নারী বিদ্বেষীরা সর্বভারতীয় টিভি ক্যামেরার সামনে এক বিতর্কসভায় এক মহিলাকে অকথ্য গালিগালাজে ক্ষান্ত না হয়ে সপাটে চড়িয়ে দিয়েছেন। এই নোংরামি কিন্তু জনমানসে গাঁথা হয়ে গেল। ভোটব্যাঙ্কের

রাজনীতি কখনই ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়নি। সেই শাহবানো মামলার সময় থেকেই এ আই এম পি এল বি-এর ট্র্যাক রেকর্ড সকলেরই জানা। এই সংস্থার মাতব্বররাই রাজীব গান্ধীকে চাপ দিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে গিয়ে অর্ডিন্যান্স জারি করতে বাধ্য করেছিল। অথচ সর্বোচ্চ আদালত ৭৫ বছর বয়স্কা স্বামী পরিত্যক্তা শাহবানোকে সংবিধান প্রদত্ত অধিকার বলে অন্তত বেঁচে থাকার মতো খোরপোশ দেওয়ার স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিল। এক্ষেত্রে কোরানের মূল ভিত্তিগুলির এমন অমর্যাদাও 'তালাক এ বিদ্দাত'-এর মতো কুপ্রথাকে বরাবর চোখ কান বুজে কংগ্রেস দলের সমর্থন দেওয়ার ফলেই এই ধরনের অসাংবিধানিক আচরণগুলি ভায়াবহ আকার ধারণ করছে। সত্যিই কী ভাবলে অবাক হতে হয় না যে কিছু সংকীর্ণমনা, অতি উৎসাহী ইসলামপন্থী কেন ভারতের মতো একটি প্রতিষ্ঠিত বিশাল গণতান্ত্রিক দেশে শারিয়া আইন প্রতিষ্ঠিত করতে এমন উঠে পড়ে লেগেছে?

এই আইনের আওতায় হাত পা কেটে নেওয়া বা মুণ্ডচ্ছেদের কথা চিন্তা করলে এক বর্বর যুগের আতঙ্ক কি মনে আসে না? শরিয়া আইনে সুদ নেওয়া হারাম। আজ কত জন তাদের ব্যাঙ্কে সঞ্চিত অর্থের সুদ ছেড়ে দিতে রাজি? প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় অন্য ধর্মের বহু রীতি যা ইতিমধ্যেই স্বভাবগত হয়ে গেছে তাকে পরিহার করতে কতজন সত্যিই প্রস্তুত?

ভারতের অন্যান্য সমস্ত নাগরিকের মতোই ভারতীয় মুসলমানরাও সবরকমের দেওয়ানি ও ফৌজদারি অপরাধের ক্ষেত্রে ইন্ডিয়ান পেনাল কোডই মেনে চলেন। তাহলে কী করে কেবলমাত্র সাংসারিক জীবনের ক্ষেত্রেই তাদের ধর্মভিত্তিক আইন প্রয়োগ না হলে ব্রহ্মাণ্ড রসাতলে যাচ্ছে?

আচ্ছা, সর্বোচ্চ আদালতের হস্তক্ষেপের ফলে যদি তাদের সম্প্রদায়গত অধিকার খর্ব হচ্ছে বলে তারা মনে করে সেক্ষেত্রে কি পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে তারা গোটা আই পি সি-কেই চ্যালেঞ্জ করবে? অবশ্য এর মধ্যে আবশ্যিকভাবেই থাকবে ক্রিমিন্যাল প্রোসিডিওর অ্যাক্ট যা কিন্তু শাস্তির ক্ষেত্রে তাদের ধর্মানুসারে পরিচালিত দেশে প্রদত্ত ইসলামিয় শাস্তির থেকে আলাদা।

এই পচন অত্যন্ত গভীর। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই তিন তালাক ও নিকা হালালার বলি মেয়েদের ক্ষেত্রে ন্যায় বিচারকে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। এটা বরাবরের প্রশ্ন, আদৌ নির্দিষ্ট কোনো কেস ভিত্তিক নয়। সেই কারণে ২০১৭ সালের ২২ আগস্ট ভারতীয় 'মুসলিম পার্সোনাল ল'-এর ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী দিন। মৌলবিদের খেয়ালখুশিমতো ফতোয়ার বলে হাজার হাজার ন্যায় বিচার-বঞ্চিত নারীদের জীবনে এই রায়ের মাধ্যমে সংবিধান প্রদত্ত ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। ওইদিন পাঁচ বিচারপতির একটি বেঞ্চ ষাঁড়ের শিং ধরার মতো একেবারে ল্যাজে পা দিয়ে দেয়। ইসলামের বিধানে কী লেখা আছে তা প্রকাশ্যে পড়ে শোনায়। ঝুলি থেকে বেড়াল বেরিয়ে পড়ে। বিচারপতিরা ঘোষণা করেন একপক্ষীয় বিবাহ বিচ্ছেদ অর্থাৎ 'তালাক এ বিদ্দাত' সম্পূর্ণ ভারতীয় সংবিধান বিরোধীই নয় এটি যুগপৎ ইসলাম বিরোধীও।

বলতেই হবে ভারতীয় বিচারব্যবস্থা অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও গভীর মনোনিবেশ সহকারে সমস্যার মধ্যে প্রবেশ করেছিল। কোরানের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা দেওয়ার সময় এর সংবেদনশীলতা নিয়ে বিচারপতিরা ছিলেন সজাগ। একই সঙ্গে ভারতীয় সংবিধানের অন্তর্নিহিত বাণী সম্পর্কেও ছিল তাঁদের ক্ষুরধার মস্তিষ্কের যথাযোগ্য প্রয়োগ।

অন্যদিকে মোল্লাবাহিনী, ইমাম ও কাজির দল তাদের নিজেদেরই দ্বারা নিয়োজিত কিছু তথাকথিত ইসলামীয় পণ্ডিতকুল যারা নাকি কিছু ইসলামীয় ন্যায়বিচার ব্যবস্থার জ্ঞান অর্জন করে তাঁদের মর্জিমাফিক ঝাড়াই বাছাই করে যথার্থ ইসলামীয় ন্যায়বিচার বিতরণ করার অধিকার অর্জন করেছেন।

আজকের ভারতে পেছন ফিরে তাকাবার সময় নয়। 'দারুল কাজা' নামের পার্সোনাল ল' কোর্ট যা 'মূর্খের যুগের' সময় প্রচলিত ছিল সে দিকে ব্যাক প্রজেকশনে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভারতীয় গণতন্ত্রের সর্বাপেক্ষা শক্তিমান ও গুরুত্বপূর্ণ যে স্তম্ভ সেই ভারতীয় বিচার ব্যবস্থা দেশের শেষ বিচারপ্রার্থী নারীটি যাতে ন্যায়ের ছত্রছায়ায় আসতে পারে তা নিশ্চিত করতে দ্বিধা করবে না।

একই সঙ্গে এটাও মনে হয় যখন কংগ্রেস সভাপতি টুইট করেন যে তিনি সর্বদা ভারতের "শোষিত, বঞ্চিত, নির্যাতিত প্রান্তিক মানুষটির পাশে আছেন", নিশ্চয় তিনি মুসলমান পুরুষের পাশবিক অত্যাচারের শিকার এই সমস্ত নিগৃহীত মহিলাদের বাদ দেননি। আমার আশা তিনি তাদের পাশেই দাঁড়াবেন। তাই না?

(লেখিকা সাংবাদিক এবং টাইমস্ অব ইন্ডিয়ার স্তম্ভ লেখক)

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার আট পাতা বৃদ্ধি এবং আংশিক রঙিন হওয়া সত্ত্বেও গ্রাহকদের কথা ভেবে আমরা পত্রিকার মূল্যবৃদ্ধি করিনি, পুরানো দামেই (১০ টাকা) এতদিন আমরা পরিবেশন করে এসেছি। কিন্তু ক্রমাগত ছাপার কাগজ ও অন্যান্য খরচ বেড়ে যাওয়ায় বাধ্য হয়েই স্বস্তিকার মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে। আগামী ২ সেপ্টেম্বর ২০১৮, শুভ জন্মাষ্টমী থেকে 'স্বস্তিকা'র প্রতি কপির দাম ১২ টাকা হচ্ছে। বার্ষিক গ্রাহক ৫০০ (পাঁচশত) টাকা।

আশা করি, আমাদের অসুবিধার কথা অনুভব করে আপনারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন।

—সম্পাদক, স্বস্তিকা

রম্যরচনা

একটি মাতাল রোজ পানশালায় এসে তিনজনের জন্য নির্দিষ্ট একটি টেবিল বুক করে তিন পাত্র মদের অর্ডার দেয়। কিন্তু কোনোদিনই তার সঙ্গে আর কেউ আসে না। সে একাই আসে আর তিন পাত্র মদ একাই খায়। এই দেখে পানশালার মালিক একদিন মাতালকে জিজ্ঞেস করল— আচ্ছা, আপনি তো একাই আসেন। তাহলে তিনজনের টেবিল বুক করেন কেন, আর তিন পাত্র মদই বা নেন কেন? মাতাল বলল— আমরা তিনজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম। তিনজন একসঙ্গে বসেই মদ খেতাম। এখন দুজন অনেক দূরে চলে গেছে। কিন্তু আমি যখন রোজ মদ খেতে আসি, ওরাও আমার সঙ্গে আসে বলে আমার মনে হয়। কাজেই এক পাত্র মদ আমি নিজের জন্য খাই। বাকি দুপাত্র ওদের হয়ে খাই। উত্তর শুনে পানশালার মালিক চমৎকৃত।

একদিন এই মাতাল পানশালায় ঢুকে তিনজনের টেবিল বুক করল, কিন্তু দু'পাত্র মদের অর্ডার দিল। তাই দেখে অবাক হয়ে পানশালার মালিক জিগ্যেস করল— কী ব্যাপার, আজ যে দু' পাত্র অর্ডার দিলেন?

মাতাল— আসলে কাল রাতে আমার বউ মদ খাওয়ার জন্য খুব বকাঝকা করেছে। তাই আমি মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু আমার দুই বন্ধু তো মদ খাওয়া ছেড়ে দেয়নি। আমি ওদের হয়ে খাচ্ছি।

উবাচ

"ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির জন্যই তৃণমূল, সপা, বসপা ও কংগ্রেসের মতো বিরোধী দলগুলি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের হয়ে গলা ফাটাচ্ছে।"

অমিত শাহ
বিজেপির জাতীয় অধ্যক্ষ

এন আর সি নিয়ে বিরোধীদের রাজনীতি প্রসঙ্গে

"নাগরিকপঞ্জি বিষয়টি কংগ্রেসের মস্তিষ্কপ্রসূত। রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্য বিজেপি নিজেদের বলে দাবি করছে।"

তরুণ গগৈ
অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী

নাগরিকপঞ্জি নিয়ে দিল্লিতে সাংবাদিক সম্মেলনে

"আমি সবাইকে অনুরোধ করছি, মহিলাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করুন, সম্মান করুন, তাদের যত্ন নিন। এটা আমাদের দায়িত্ব।"

সচিন তেণ্ডুলকর
ক্রিকেটার তথা প্রাক্তন সাংসদ

দেশে নারী নিরাপত্তা সংক্রান্ত এক টুইট বার্তায়

"বিহারে জেডিইউ এবং বিজেপির মধ্যে জোট শুধু ২০১৯-র লক্ষ্যে নয়। গত চার দশক ধরে রয়েছে এই জোট। বিহারে দুই দলের জোট মানে দুটি হৃদয়ের মিলন।"

নিত্যানন্দ রাই
বিহার বিজেপির রাজ্য সভাপতি

লোকসভা নির্বাচনে দুই দলের আসন সমঝোতা প্রসঙ্গে

"মুজফ্‌ফরপুর বালিকা নিগ্রহের তদন্ত সিবিআই করবে। এই নিয়ে অযথা পরিস্থিতি অশান্ত করা হচ্ছে।"

নীতীশকুমার
বিহারের মুখ্যমন্ত্রী

মুজফ্‌ফরপুর কাণ্ড নিয়ে বিরোধীদের রাজনীতি প্রসঙ্গে

গান্ধীজীর সম্মতি ও উপস্থিতিতেই ভারতভূমি দ্বিখণ্ডিত হয়েছে

ড. নির্মলেন্দুবিকাশ রক্ষিত

সকলেই জানেন যে, ১৯৪০ সালের লাহোর অধিবেশনে মুসলিম লিগ পাকিস্তান প্রস্তাবের মাধ্যমে ভারতভাগের দাবি তুলেছিল। অনেকের ধারণা— গান্ধীজী এতে তীব্র আপত্তি জানিয়েছিলেন এবং দেশকে অবিভক্ত রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ইতিহাস অন্য কথা বলে। সেটা একটু বিশ্লেষণ করা দরকার।

এটা ঠিক যে, তাঁর অনেক কথা ও ভাষণ থেকে মনে হবে যে, তিনি এই দেশভাগের তীব্র বিরোধী ছিলেন। মৌলানা আজাদকে তিনি বলেছেন, দেশভাগ হতে পারে তাঁর মৃতদেহের ওপরেই 'If the Congress wants to accept partition, it will be over my deadbody. So long I am alive, I will never agree to the partition of India. Nor will I, if I can help, allow Congress to accept, it.'—(আজাদ-ইন্ডিয়া উইন্স ফ্রিডম, পৃ. ১৬৭)। এক প্রার্থনা সভায় তিনি জানিয়েছেন— সারা দেশ যদি জ্বলতে থাকে, যদি তরবারির মুখেও দেশভাগের দাবি ওঠে, তবু তিনি তাতে রাজি হবেন না— (লাম্‌লি— দ্য ট্র্যান্সফার অব পাওয়ার ইন্ ইন্ডিয়া, পৃ. ১৬১)।

এই সব কথা ও ভাষণ থেকে এই ধারণা জন্মায় যে, তিনি শেষ পর্যন্ত দেশকে অবিভক্ত রাখার জন্য আপ্রাণ লড়াই করেছেন। কিন্তু একটু বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে যে, এটা এক ভ্রান্ত ধারণা।

আসলে, তিনি বুঝেছিলেন যে, তাঁর শিষ্যরা অর্থাৎ নেহরু, সর্দার প্যাটেল, রাজাগোপালাচারী প্রমুখ কংগ্রেস-নেতা ক্রমে দেশবিভাগের দিকে ঝুঁকেছেন, সেটাকে গ্রহণ করতে চাইছেন স্বাধীনতার মূল্য হিসেবে। তার ফলে তিনিও ক্রমে মনের দিক থেকে দুর্বল হয়ে গেছেন। ড. এস এন সেন লিখেছেন, 'Gandhiji's earlier attitude towards partition began to wear away due to the pressure put on him by Mountbattan and Patel'— (হিস্ট্রি অব দ্য ফ্রিডম মুভমেন্ট ইন্ ইন্ডিয়া, পৃ. ৩৩৫)।

কিন্তু মাউন্টব্যাটেন নন, তাঁকে দুর্বল করে দিয়েছিল নেহরু- প্যাটেল প্রমুখ নেতাদের দ্বিধাগ্রস্ততা। প্রখ্যাত সাংবাদিক দুর্গা দাস জানিয়েছেন, গান্ধীজী তখন নির্ভর করেছেন জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রমুখ নেতাদের ওপর। কিন্তু তাঁরা তখন কংগ্রেসের দ্বিতীয় সারিতে অবস্থান করতেন।

অবশ্যই ঠিক যে, দেশবিভাগের ব্যাপারে উদ্যোগটা নিয়েছিলেন বড়োলাট মাউন্টব্যাটেন। জিন্না, লিয়াকত আলি প্রমুখ লিগ নেতাদের সঙ্গে কথা বলে তিনি বুঝেছিলেন যে, পাকিস্তান আদায় না করে তাঁরা ছাড়বেন না। তাই তিনি কংগ্রেস নেতাদের ওপর এই ব্যাপারে চাপ সৃষ্টি করেছেন।

কংগ্রেস-নেতাদের মধ্যে প্রথমে গান্ধীজীই তাঁর সঙ্গে বৈঠক করেছেন। কিন্তু সেই দুটো বৈঠকই ছিল অর্থহীন। দ্বিতীয় বৈঠকে গান্ধীজী প্রস্তাব দিয়েছেন— সরকার জিন্নার হাতে ক্ষমতা দিয়ে বিদায় নিক।

প্রস্তাবটা ছিল অবাস্তব, অদ্ভুত ও অযৌক্তিক। ধূর্ত বড়োলাট প্রকাশ্যে তার তারিফ করে পরবর্তী স্তরে কংগ্রেস-নেতাদের কাছে এই নিয়ে রঙ্গ-ব্যঙ্গ করেছেন এবং কংগ্রেসও প্রস্তাবের মাধ্যমে সেটা বাতিল করেছে। হতাশাগ্রস্ত গান্ধীজী তখন তাঁর শান্তি মিশনে বিহারে চলে গেছেন— আর তিনি কোনও আলোচনায় অংশ নেননি। তিনি অবশ্যই জানতেন তাঁর শিষ্যরা তখন দেশভাগের দিকে ঝুঁকেছেন— তবু তাঁদের নিরস্ত না করে তিনি রণে ভঙ্গ দিয়েছেন পরাজিত সেনাপতির মতো। লিওনার্ড মস্‌লে লিখেছেন, চতুর বড়োলাট দুটো বৈঠকের মাধ্যমেই গান্ধীজীকে সরিয়ে দিয়েছেন রাজনীতির নেপথ্যে— 'The viceroy's clever manoavering after his first two meetings with the Mahatma had already exiled him to the periphary of the Congress movement'— (দ্য লাস্ট ডেজ অব দ্য ব্রিটিশ রাজ, পৃ. ১০৬)।

এবার প্যাটেলের পালা। বড়োলাটের ভয় ছিল কংগ্রেসের 'স্ট্রংম্যান' সর্দার প্যাটেল বিরাট বাধার সৃষ্টি করবেন। কিন্তু একটা বৈঠকেই তিনি তাঁকে কাবু করে ফেলেছেন। তাঁর যুক্তি ছিল তিনটে। প্রথমত, প্যাটেলের উদ্যোগেই ইতিমধ্যে কংগ্রেস পঞ্জাবকে দ্বিধাবিভক্ত করার প্রস্তাব দিয়েছে। তাহলে এবার ব্যাপারটাকে আর একটু বিস্তৃত করা যায়। দ্বিতীয়ত, অন্তর্বর্তী সরকারে কংগ্রেস ও লিগের মন্ত্রীরা এক সঙ্গে ছিলেন কিন্তু সেখানে হয়েছে নিত্যনতুন দ্বন্দ্ব। সেক্ষেত্রে তাঁদের পৃথক থাকাই ভালো। তৃতীয়ত, সেক্ষেত্রে কংগ্রেস গণ্ডগোল ছাড়াই খণ্ডিত ভারতকে ইচ্ছেমতো গড়ে তুলতে পারবে।

গান্ধীজী মৌলানা আজাদকে বলেছিলেন— দেশভাগ হতে পারে তাঁর মৃতদেহের ওপরেই। কিন্তু সেটা হয়নি— তাঁর সম্মতি ও উপস্থিতিতেই ভারতভূমি দ্বিখণ্ডিত হয়েছে।

প্যাটেল যখন নিঃশব্দে ও বিষণ্ণ মুখে বেরিয়ে এসেছেন, বড়োলাট আনন্দে চিৎকার করে উঠেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে, আর কোনও বাধা থাকবে না। এর পরে প্যাটেলের কাজ হয়ে উঠেছে দেশভাগের ব্যাপারে সহকর্মীদের সম্মত করা। তিনি একান্ত বৈঠকে গান্ধীজীকেও প্রভাবিত করেছিলেন। কারণ আজাদ লিখেছেন, তিনি গান্ধীজীর কাছে যখন

গেছেন, তখন গান্ধীজী যেন প্যাটেলের কণ্ঠেই পাকিস্তান-সৃষ্টির পক্ষে কথা বলেছেন।

নেহরুর জন্য বড়োলাট তখন নিয়েছেন অন্য পথ। তাঁদের আগেই সিঙ্গাপুরে আলাপ হয়েছিল— সেটা এবার বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছে। নেহরু মাঝে মাঝেই বড়লাটের সঙ্গে প্রাতঃরাশ সেরেছেন, ফলে লেডি মাউন্টব্যাটেনও হয়ে উঠেছেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। বিপত্নীক নেহরু তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন বেশি করে। আজাদ লিখেছেন, নেহরুর মনোভাব পরিবর্তনের অন্যতম কারণ হলো লেডির প্রভাব— (ঐ, পৃ. ১৯৮)।

অতঃপর বড়োলাটের কাজটা সহজ হয়ে গেছে। ১৯৪৭ সালের ৩ জুলাই তিনি বিভিন্ন দলের নেতাদের ডেকেছেন তাঁর ছকটা পাশ করার জন্য। তাতে গান্ধীজীও ছিলেন। বড়োলাটের ভয় ছিল— শেষ সময়ে গান্ধীজী হয়তো বাধা হয়ে উঠবেন। কিন্তু তিনি হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন। কারণ গান্ধীজী একটা কাগজের টুকরোয় লিখে জানিয়েছেন— সেটা তাঁর মৌন দিবস (কৃষ্ণ কৃপালনী-গান্ধী, পৃ. ৯৭৬)।

এভাবেই তিনি প্রতিবাদ জানানোর একটা বড় সুযোগ ইচ্ছে করে নষ্ট করেছেন।

১৪ ও ১৫ জুন কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবের ভিত্তিতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠক বসেছে। সেটা ১৫৭/২৯ ভোটে গৃহীত হয়েছে। চৈতরাম বিদেয়ানী, হাফিজুর রহমান, ড. কিচ্‌লু প্রমুখ নেতা এর তীব্র বিরোধিতা করে বক্তব্য রেখেছেন। গান্ধীজী কিন্তু তাঁদের দিকে ভিড়ে যাননি। ৩২ জন সদস্য ভোটে অংশ নেননি— (ড. নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য— ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস, পৃ. ২৩৫)। গান্ধীজী সেই দিকেও ছিলেন না। তিনি বরং গরিষ্ঠের দিকেই ভোট দিয়েছেন, এমনকী দেশবিভাগের পক্ষে ভাষণও দিয়েছেন।

এটা ঠিক যে, প্রথম দিকে তিনি দেশভাগের ছকটা মেনে নেননি। তাঁর শিষ্যরা সেই দিকে ঝুঁকে যাওয়ার সময়ও তিনি বলেছেন, 'I do not agree with what my closest friends have done or are doing'— (লুই ফিচার— দ্য লাইফ অব মহাত্মা গান্ধী, পৃ. ২৮৫)। কিন্তু ক্রমে তিনিও পিছু হঠেছেন, নতি স্বীকার করেছেন চাপের কাছে।

কিন্তু এটা লক্ষণীয় যে, মাউন্টব্যাটেন আসার পর চাপটা বেড়ে গেছে ঠিকই, কিন্তু তার আগেই ১৯০২ সালের ২০ জুন গান্ধীজী ফকির নাজির আমেদকে জানিয়েছেন যে, কিছু শর্তসাপেক্ষে তিনি দেশভাগে রাজি আছেন— (ড. বি.সি. রাউত— ডেমোক্র্যাটিক কন্‌স্টিটিউশান অব ইন্ডিয়া, পৃ. ৫৬)। ১৯৪৪ সালে রাজাজী তৈরি করেছেন তাঁর 'স্পোর্টিং ফর্মূলা— তার মধ্যেই ছিল দেশভাগের বীজ। কিন্তু সেটা নিয়েই গান্ধীজী জিন্নার সঙ্গে সাগ্রহে বৈঠক করেছেন— (ড. জে. সি. জোহারী— ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স, পৃ. ১৫৪)।

এর পরেও বলা উচিত যে, দেশভাগের ব্যাপারে তাঁর কোনও দায় ছিল না বা তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী?

ড. সরলকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, আজাদ ও গান্ধীজী ছিলেন দেশবিভাগের বিরুদ্ধে—(ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ (পৃ. ৪৮৯)। অনুরূপভাবে ভিন্সেন্ট সীয়ানও মন্তব্য করেছেন, সেই প্রস্তাব গান্ধীজী কখনও মেনে নেননি— ('But it naver received his approval–never more than his passive acceptance'— মহাত্মা গান্ধী, পৃ. ১৭০)।

কিন্তু আগেই বলেছি— মাউন্টব্যাটেন ভারতে এসে (২২.৩.৪৭) দেশভাগের ব্যবস্থা করলেও তিনি আসার আগেই গান্ধীজী ফকির বাজির আমেদকে জানিয়েছেন যে, কিছু শর্তসাপেক্ষে তিনি পাকিস্তান-প্রস্তাব মেনে নিতে পারেন। রাজাজীর স্পোর্টিং ফর্মূলার ভিত্তিতে তিনি জিন্নার সঙ্গে বৈঠকও করেছেন। কিন্তু তখন তো এই ব্যাপারে নেহরু-প্যাটেলের চাপ তাঁর ওপর তেমন পড়েনি। তাহলে ১৯৪২-৪৪ সালেই তিনি স্ব-বিরোধী মন্তব্য করেছেন কেন?

ড. নিতাই বসুর মতে, অনেক আগেই গান্ধীজী পাকিস্তান সৃষ্টির যুক্তি মেনে নিয়েছিলেন। নোয়াখালিতে শান্তি স্থাপন করতে গিয়ে তিনি একবার জানিয়েছিলেন যে, একটা স্বতন্ত্র মুসলমান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় তাঁর কোনও আপত্তি নেই। কারণ পরিস্থিতির চাপ রয়েছে— (ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম, পৃ. ২৩৯)।

সুতরাং বলা যায়, এই ব্যাপারে তিনি প্রচণ্ড দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছিলেন। তিনি কখনো দেশবিভাগের তীব্র বিরোধিতা করেছেন, কখনো আবার সেটা মেনেও নিয়েছেন। মাউন্টব্যাটেন এসে যখন তাঁর শিষ্যদের কবজা করেছেন, তিনি তখন আরও হতাশ হয়ে গেছেন।

কিন্তু তিনি তাঁদের কাছে আত্মসমর্পণ না করে নৈতিক প্রতিবাদ জানালেন না কেন? নেহরু-ব্যাটেনকে ফাঁকা মাঠ ছেড়ে দিয়ে তিনি কেন বিহারে পালালেন? ৩ জুনের সেই গুরুত্বপূর্ণ দিনটাকেই বা কেন মৌনদিবস হিসেবে বেছে নিলেন ও ১০ জুনের বৈঠকে ২৯ জন সদস্য ওই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন— গান্ধীজী তাঁদের দিকে ছিলেন না কেন? তিনি আগে থেকে বিরোধিতা করলে বিরোধীরা আরও উৎসাহ পেতেন, ভোটের ফল অন্য রকমও হতে পারত। এমনকী, ৩২ জন ভোট দানে বিরত ছিলেন— গান্ধীজী তাঁদের সঙ্গেও ছিলেন না। তিনি বরং পাকিস্তান প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছেন। এমনকী, তার সমর্থনে জোরালো বক্তব্যও রেখেছেন। তিনি বলেছেন, ওয়ার্কিং কমিটি যখন ওই প্রস্তাব মেনে নিয়েছে, তখন কংগ্রেস- কর্মীদের সেটা গ্রহণ করাই উচিত। তাছাড়া জটিল পরিস্থিতিতেই এটা গ্রহণ করতে হয়েছে, এছাড়া অন্য উপায় ছিল না— (ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়— মহাজীবন, পৃ. ১২৭)। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারও মন্তব্য করেছেন, তিনি আগের বিরোধিতা ত্যাগ করে হঠাৎ দেশভাগের ব্যাপারটা মেনে নিয়েছেন সেই অধিবেশনে— 'he suddenly veered round and supported a resolution for partitioning Bengal and Punjab on June 14'— (হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১৪)।

অনেক আগে তিনি মৌলানা আজাদকে বলেছিলেন— দেশভাগ হতে পারে তাঁর মৃতদেহের ওপরেই। কিন্তু সেটা হয়নি— তাঁর সম্মতি ও উপস্থিতিতেই ভারতভূমি দ্বিখণ্ডিত হয়েছে।

আসলে, দ্বিধাগ্রস্ত গান্ধী অনেক আগেই দেশভাগ মেনে নিয়েছিলেন এবং বুঝেছিলেন তার অনিবার্যতার কথা। কমলকুমার সান্ন্যাল মন্তব্য করেছেন, তাই তিনি তাঁর চরম অস্ত্র আমরণ অনশনের দিকে যাননি— (ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সংগ্রামী কারা, পৃ. ১২৯)।

এই ব্যাপারে নেহরুকে প্রশ্নটা করেছিলেন লিউনার্ড মস্‌লে। নেহরু বলেছিলেন, But if Gandhiji had told us not to we would have go on fighting and waiting'— (ঐ, পৃ. ২৮৫)।

কিন্তু নেহরু প্রমুখ নেতারা তখন গান্ধীজীকে কতটা মানতেন জানি না। কিন্তু তিনি সেই চেষ্টাটা করেননি কেন? ▌

ভারতের স্বাধীনতা দিবস আনন্দে-বিষাদে ভরা

মণীন্দ্রনাথ সাহা

একাত্তর বছর আগে যে সদ্যোজাত কন্যাটি স্বাধীন ভারতে আঁতুড় ঘরে মায়ের নাড়ি কেটে স্বাধীনতার নিঃশ্বাস নেওয়ার প্রত্যয়ে চোখ মেলেছিল, সেদিন তার শরীরে কোনও আবরণ ছিল না। কিন্তু তাতে তার লজ্জা পাওয়ার কারণ ছিল না। কারণ তার বিশ্বাস ছিল স্বাধীন ভারত তার দেহে লজ্জা নিবারণের বস্ত্র দেবে। দেবে ক্ষুধার অন্ন। মাথার উপর দেবে আচ্ছাদন আর দেবে নিরাপত্তা। কিন্তু আজ ৭২ তম স্বাধীনতা দিবসে পৌঁছেও দীর্ঘশ্বাস ওঠে, হে ভগবান, এ কার স্বাধীনতা? এ কীসের স্বাধীনতা? এ কেমন স্বাধীনতা? তোষণই কি আমাদের স্বাধীনতার মূলমন্ত্র?

মহম্মদ আলি জিন্নার টু নেশন থিওরি অনেকের কাছেই বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়নি। পূর্বপাকিস্তান তথা বর্তমান বাংলাদেশের সর্বত্র হিন্দু-মুসলমান পরিবার ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী হিসেবে বছরের পর বছর বসবাস করেছে। অথচ দুই সম্প্রদায়কে আলাদা করার কথা নেতারা প্রচার করেছেন নিজেদের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্য।

অবশেষে এল সেইদিন। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ইংরেজদের নাগপাশ থেকে মুক্তি ঘোষণা হলো সারাদেশ ও দেশবাসীর। বিশ্বসভায় নতুন দেশের অভ্যুদয় হলো— ভারত।

সেই পনেরোই আগস্টে আনন্দের বিপরীতেই ছিল দুঃখের বেদনা। দুঃখ দাঙ্গার, দুঃখ দেশভাগের। স্বাধীনতা লাভের আগে এক দীর্ঘ প্রাণঘাতী দাঙ্গার শিকার হতে হয়েছে দেশের মানুষকে। অন্যদিকে দেশভাগের হাত ধরে নেমেছিল উদ্বাস্তুর ঢল। ফলে স্বাধীনতার দীর্ঘ প্রতিষ্ঠিত আনন্দের মধ্যেই প্রত্যেকে অনুভব করেছিল প্রিয়জন হারানোর ব্যথা ও উদ্বাস্তু প্রিয়জনের শিকড়ছেঁড়া বেদনার অনুভব— হরিষে বিষাদ।

'৪৭-এর আগস্ট থেকে অক্টোবরের মধ্যে পঞ্জাবের পরিস্থিতি গৃহযুদ্ধের আকার নিয়েছিল। শোনা যায়, শুধুমাত্র পঞ্জাবে ওই সময় ৩০ লক্ষ মানুষ মেরে ফেলা হয়।

আমরা যদি পেছন ফিরে দেখি তাহলে দেখতে পাব— ব্রিটিশ শাসকের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে জাতীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব দেশের সর্বনাশ করেছিলেন। সেদিন কংগ্রেস, মুসলিম লিগ এবং ইংরেজ শাসকরা মিলে যে স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করেছিল তা আসলে সোনার পাথরবাটি। আসলে কংগ্রেসের পতাকাকে একটু অদল বদল করে পণ্ডিত নেহরু দ্বিজাতিতত্ত্ব এবং ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ মেনে নিয়ে দেশ স্বাধীন হলো বলে সবাইকে বিভ্রান্ত করেছিলেন। যার মাশুল আজও দিতে হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও বোধহয় দিতে হবে।

১৯৪৬ সালের এক সাময়িক পত্রিকা লিখেছিল— 'মুসলিম লিগ কর্তৃক ঘোষিত প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' দিবস ১৬ আগস্ট শুক্রবার প্রাতঃকাল হইতে কলকাতা ও শহরতলী অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে ঘোরতর দাঙ্গা শুরু করে। ...সর্বত্র বেপরোয়া লুঠতরাজ, অগ্নিকাণ্ড ও হত্যার তাণ্ডবলীলা শুরু হয়। ট্রাম, বাস এবং অন্যান্য যানবাহন বন্ধ হইয়া কলকাতা বহির্জগতের সহিত সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। ...বাংলা সরকার ৯ ঘটিকা পর্যন্ত শহরে সান্ধ্য আইন জারি করে।

১৭ আগস্ট শনিবার দাঙ্গার অবস্থা চরমে ওঠে। এইদিন অধিকতর ব্যাপকভাবে কলকাতা মহানগরীর বুকের উপর দিয়া নারকীয় হত্যাকাণ্ড ও বেপরোয়া লুণ্ঠন এবং গৃহদাহের অনুষ্ঠান চলিতে থাকে। উহার ফলে যে কত লোকের জীবন বিনষ্ট হইয়াছে, তাহা সঠিকভাবে নির্ণয় করা অসম্ভব। ১৮ আগস্ট রবিবার পর্যন্ত কলকাতার অবস্থা

দেশভাগের খলনায়ক

সমভাবে ভয়াবহ ও অপরিবর্তিত থাকে।'

তৃতীয়দিনে শুরু হলো পাল্টা আক্রমণ। এবার সেনাবাহিনীকে তলব করলেন লিগ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শহিদ সুরাবর্দি সাহেব। ব্রিটিশ মুখপাত্রের ভাষায় জানা যায়— "It was only when the Hindus and Sikhs had came out in retaliaitions that the Chief Minister had called for military aid...' (The Last Days of the British Ray : Leonard Mosley ; P-33)

সেই প্রত্যক্ষ সংগ্রামে সেদিন প্রাণ দিতে হয়েছিল দশ হাজার লোককে। এরপর প্রায় দু'মাস পরে নোয়াখালি জেলায় ১০ অক্টোবর বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীপূজোর দিন থেকে ব্যাপকভাবে খুন, অগ্নিসংযোগ, লুঠ, বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা, নারীহরণ এবং ধর্মস্থান অপবিত্র করা হয়।

সরকারি মতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল নোয়াখালি জেলার মোট ৪,৪৩৬টি গৃহ লুণ্ঠিত এবং ২,৫৯৯টি গৃহ ভস্মীভূত। আর ত্রিপুরা জেলায় ভস্মীভূত ৬,৫২০টি গৃহ। এছাড়া ঢাকা জেলাও আছে।

আমরা অনেকেই মনে করি এবং দেশভাগের জন্য মাউন্ট- ব্যাটেনকে দোষ দিয়ে থাকি। কিন্তু প্রকৃত দোষী তো কংগ্রেস দলের বড় বড় নেতারা। যেমন— ১৯৪২ সালেই সর্বপ্রথম ভারত বিভাগের দাবি তুলেছিলেন কংগ্রেসের অন্যতম মস্তিষ্ক চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারিয়া। শুধু মুখেই নয়, সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে এই মর্মে এক প্রস্তাবও তিনি পাশ করিয়ে নিয়েছিলেন মাদ্রাজ কংগ্রেস বিধানমণ্ডলী পার্টির সভা থেকে। বয়ানটা ছিল : '...This Party is of opinion and recomends to the All India Congress Committee that to sacrifice the Chanches of formation of a National Government at this grave crisis for the doubtful advantage of maintaining a cantroversy over the unity of India is a most unwise policy and that it has become necessary to choose the lesser evil and acknowledge the Muslim League's claim for Partition...' এরপর আর মাউন্টব্যাটেনকে দোষ দেওয়া যায় না।

> আজ যারা নরেন্দ্র মোদীর দিকে আঙুল তুলে দেশ সংকটের মধ্যে, দেশে অসহিষ্ণুতা বেড়ে গেছে বলে চেঁচামেচি করছেন, এত প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তাঁরা কি তাঁদের পূর্বসূরিদের করা পাপের কথা ভুলে গেছেন?

এর ঠিক পাঁচ বছর পরে ১৯৪৭ সালের ৮ মার্চ গান্ধীজী এবং মৌলানা আবুল কালাম আজাদের অনুপস্থিতিতে ওয়ার্কিং কমিটি থেকে পঞ্জাব বিভাগের প্রস্তাব পাশ করিয়ে দেওয়া হয়। সেই প্রস্তাবটা ছিল— "In view of the tragic events of the Punjab, it is necessary to find a wayout which involves the least amount of compulsion. This would necessitate a division of the Punjab into two Provinces, So that the predominately Muslim Part may be separated form the predominately non-Muslim Part."

কাজেই মাউন্টব্যাটেনকে দোষ দেওয়া মূর্খামি, তার আরও কারণ তিনি বড়লাট হয়ে এসেছিলেন ১৯৪৭ সালের ২২ মার্চ। আর কংগ্রেস নিজে রাজি না হলে কী মুসলিম লিগ, কী কমিউনিস্ট পার্টি, কী মাউন্টব্যাটেন কারো পক্ষেই ভারতভূমির অঙ্গচ্ছেদ করা সম্ভব হতো না।

অথচ সুদূর বার্লিন থেকে বা দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার আজাদ হিন্দ রেডিও থেকে সুভাষচন্দ্র বোস বারবার সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন এই বলে যে— 'আমাদের পবিত্র জন্মভূমি যেন দ্বিখণ্ডিত না হয়।'

'I have no doubt that if India is divided, she will be ruined. I vehemently oppose the Pakistan Scheme for the vivisection of our motherland, our divine motherland shall not be cut-up."

হাজার বছরের বিদেশি আক্রমণের মধ্যেও আমরা ভারতকে ভারত বলার অধিকার হারাইনি, হিন্দুস্থান বলার অধিকার হারাইনি, অথচ আমরা যখন স্বাধীন হলাম, তখনই আমরা অধিকার হারালাম সিন্ধুকে হিন্দু বলার, আমরা অধিকার হারালাম সিন্ধু-শতদ্রু-বিপাশাকে আমাদের পবিত্র নদী বলার। আমরা অধিকার হারালাম দেবীতীর্থ হিংলাজকে আমাদের তীর্থ বলার, গুরু নানকের জন্মস্থান নানকানা সাহেবকে আমাদের 'পবিত্র স্থান' বলার। আমরা যখন স্বাধীন হলাম তখনই আমরা অধিকার হারালাম সূর্য সেন, প্রীতিলতার রক্তে সিঞ্চিত চট্টগ্রামের মাটিকে আমাদের মাটি বলার, জটেশ্বরী, ঢাকেশ্বরী, রমনার কালীকে 'আমাদের দেবী' বলার। আর সব চাইতে বেদনাদায়ক যে নিজের জন্মভূমিতে বসবাস করার অধিকার হারিয়ে চলে আসতে হলো খণ্ডিত বাংলার পশ্চিম অংশে। এ কেমন স্বাধীনতা?

আজ যারা নরেন্দ্র মোদীর দিকে আঙুল তুলে দেশ সংকটের মধ্যে, দেশে অসহিষ্ণুতা বেড়ে গেছে বলে চেঁচামেচি করছেন, এত প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তাঁরা কি তাঁদের পূর্ব সূরিদের করা পাপের কথা ভুলে গেছেন? তাই নরেন্দ্র মোদীর বিরোধীরা এককাট্টা হয়ে যত খুশি তাঁর বিরোধিতা করুন, পক্ষান্তরে জনমত নির্বিশেষে দেশের অখণ্ডতা বজায় রাখার জন্য কোনও হিংসাপ্রেমী জনগোষ্ঠীর তোষণ বাদ দিয়ে, নরেন্দ্র মোদীর হাতে হাত মিলিয়ে দেশ গড়ার কাজে ব্রতী হোন। কেননা দেশই যদি অন্যের দখলে চলে যায় তবে আপনারা রাজনীতি করবেন কোথায় বসে? সুতরাং আসুন, আসন্ন স্বাধীনতা দিবসে আমরা সবাই মিলে উচ্চকণ্ঠে ধ্বনি তুলি— 'ভারতমাতা কী জয়'। ▮

আত্মবিস্মৃত হিন্দু বাঙালিরা কি ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেবে না?

প্রণব দত্ত মজুমদার

'দি গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস'-এর পর সেই ছেচল্লিশেই বাংলার বুকে মুসলিম জিহাদিরা ঘটিয়েছিল আর একটি ভয়াবহ হিন্দু নরসংহার। তা ঘটানো হয়েছিল তখনকার পূববাংলার (অবিভক্ত বাংলা তখন) নোয়াখালিতে। ইতিহাসে তা 'নোয়াখালি জেনোসাইড' নামে পরিচিত হয়ে আছে।

তখন অবিভিক্ত বাংলার প্রাদেশিক সভায় মুসলিম লিগের সরকার। কলকাতায় ১৬ আগস্ট থেকে তিন দিন ধরে 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন' নামক জিহাদ করার পর মুসলিম লিগের নেতা জিন্না ভেবেছিলেন কংগ্রেসের নেতারা তাদের 'পাকিস্তান' দাবি মেনে নেবে। কিন্তু কংগ্রেস তখনও টালবাহানা করছে দেখে মুসলিম লিগ ঠিক করলো হিন্দুদের উপর আবারও বড়ো আঘাত হানতে হবে যাতে ভয়ে তাদের পাকিস্তান দাবি মেনে নেয়। এবারে জিহাদের স্থান নির্বাচিত হলো পূর্ব বাংলার নোয়াখালি। দিন ঠিক হলো ১৯৪৬ সালের ১০ অক্টোবর কোজাগরী লক্ষ্মী পূজার দিন। বাংলার ঘরে ঘরে যখন লক্ষ্মীর আবাহন চলবে। তখন তাঁদের ঘরের জীবন্ত লক্ষ্মীদের মানসম্মান মাটিতে মিশিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হলো।

নোয়াখালি ছিল নদী-নালা, খাল-বিল, হাওরে ঘেরা জায়গা। মুসলমান গুন্ডা বাহিনী রাস্তাঘাট কেটে সাঁকো পুল কেটে নোয়াখালিকে মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল। যেহেতু বেশিরভাগ জলা জায়গা, তাই নৌকাই প্রধান যানবাহন আর মাঝিমাল্লারা প্রায় সবাই মুসলমান; সুতরাং হিন্দুদের আর পালাবার পথ রইল না। নোয়াখালিতে তখন প্রায় ১৮ শতাংশ হিন্দু আর ৮২ শতাংশ মুসলমান। জিহাদিরা ঠিক করেছিল এই ১৮ শতাংশ হিন্দুকে মেরে কেটে ধর্ষণ করে ধর্মান্তরিত করে ফেলে হবে। কলকাতা নরহত্যার উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুদের হত্যা করা লুটপাট করা, কিন্তু নোয়াখালি হত্যাকাণ্ডের উদ্দেশ্য ছিল মেরে কেটে, ধর্ষণ করে হিন্দুদের মনোবল ভেঙে দিয়ে তাদের ধর্মান্তর করে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করা।

নোয়াখালিতে হিন্দুদের ললিতবাণী শোনাচ্ছেন গান্ধীজী।

নোয়াখালির এক পীর বংশের সন্তান, উঠতি উগ্র-মুসলিম লিগ-নেতা গোলাম সরওয়ার ওখানে জিহাদের নেতৃত্ব দিয়েছিল। গোলাম সরওয়ার বহুদিন ধরেই হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের খেপিয়ে তুলছিল। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ১০ অক্টোবর সকালবেলা গোলাম সরওয়ার 'সাহাপুর' বাজারে কয়েক হাজার মুসলিম লিগ সদস্যকে জড়ো করে গরম গরম হিন্দু বিদ্বেষী বক্তৃতা দিয়ে তাদের খেপিয়ে তুললো এবং উত্তেজিত জিহাদিদের বললো— 'রায়সাহেব ও সন্ন্যাসীর মুণ্ডু চাই'। 'রায়সাহেব' হলেন— রায়সাহেব রাজেন্দ্রলাল চৌধুরী, নোয়াখালি বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এবং ওই এলাকার খুব প্রভাবশালী ব্যক্তি। আর 'সন্ন্যাসী' হলেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী ত্র্যম্বকানন্দ যিনি ওই সময় রায়সাহেবের বাড়িতে থেকে সঙ্ঘের কাজ করছিলেন।

সভা শেষ হতেই উত্তেজিত মুসলমান গুন্ডারা প্রথমে বাজারের হিন্দুদের দোকানপাট লুটপাট করে আগুন লাগিয়ে দিল। তারপর তারা তিনটি দলে ভাগ হয়ে তিন দিকে আক্রমণ করতে ছড়িয়ে পড়ল।

একটি দল নারায়ণপুরের জমিদার সুরেন্দ্রনাথ বসুর বাড়ি আক্রমণ করলো। তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে তাঁর কাছারি বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিল। ওই অঞ্চলের বিভিন্ন বাড়ি থেকে বহু নারী ও শিশু বাঁচার আশায় জমিদারের কাছারি বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল, তাদের অনেকেই জ্যান্ত পুড়ে মারা গেল। যারা আগুনের ভয়ে বেরিয়ে আসছিল তাদের কুপিয়ে হত্যা করে মুসলমান জিহাদিরা। চিন্তা করুন, লক্ষ্মীপূজার দিন হিন্দু বাঙালির ঘরে ঘরে যখন কাসর ঘণ্টা শঙ্খধ্বনিতে মুখরিত হওয়ার কথা তখন নোয়াখালির বাঙালি হিন্দুদের ঘরে ঘরে নারী-পুরুষ-শিশুর মৃত্যুর আর্তনাদ আর মুসলমান জিহাদিদের হিংস্র পাশবিক উল্লাস চলছে।

অন্য একটি দল করপাড়া গ্রামে রায়সাহেব রাজেন্দ্রলাল চৌধুরীর বাড়ি আক্রমণ করে। কিন্তু সেখানে স্থানীয় হিন্দুরা প্রতিরোধ গড়ে তোলায় জিহাদিরা তখনকার মতো পিছু হটতে বাধ্য হয়। তারা আশেপাশের বাড়িগুলি লুটপাট করে আগুন লাগিয়ে দিয়ে চলে যায়। কিন্তু পরদিন ১১ অক্টোবর কয়েক হাজার জিহাদি 'আল্লা-হো-আকবর', 'হিন্দুর রক্ত চাই' ইত্যাদি ধ্বনি দিতে দিতে রায়সাহেবের বাড়ির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সারা বাড়ি ঘিরে ফেলে পেট্রল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দিল। আগুন থেকে বাঁচার জন্য যারাই বেরিয়ে আসছে তাদেরই কুপিয়ে কুপিয়ে হত্যা করল জিহাদিরা। তারা রায়সাহেব রাজেন্দ্রলাল চৌধুরীকে হত্যা করে তাঁর কাটা মুণ্ডু নিয়ে গিয়ে গোলাম সরওয়ারকে ভেট দিয়েছিল।

এইভাবে নোয়াখালি জেলার রামগঞ্জ, বেগমগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, রায়পুর, সেনবাগ, করপাড়া, নারায়ণপুর, সায়েস্থানগর, গোবিন্দপুর, নন্দিগ্রাম, দালালবাজার,

পাঁচগাও, সাহাপুর, পার্শ্ববর্তী ত্রিপুরা জেলার চাঁদপুর, চৌদ্দগ্রাম, ফরিদগঞ্জ, হাজিগঞ্জ, বুরিগঞ্জ, কচুয়া দেবীদ্বার ইত্যাদি এলাকার হিন্দুদের ঘরবাড়ি লুটপাট করে, অগ্নি সংযোগ করে, হিন্দু মন্দির ভেঙে, হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি ভেঙে, হিন্দু নারী অপহরণ করে, তাদের ধর্ষণ করে নরকের রাজত্ব কায়েম করেছিল জিহাদিরা। এখানে জিহাদিরা জোর দিয়েছিল বলপূর্বক ধর্মান্তর করার ব্যাপারে। শত শত হিন্দু রমণীকে অপহরণ করে তাদের শাঁখা পলা ভেঙে ফেলে মুসলমান পোশাক পরতে বাধ্য করা হয়েছিল। কুমারী মেয়েদের মুসলমান ছেলেদের সঙ্গে বিয়ে দিতে বাধ্য করা হয়েছে, রাজি না হলে ধর্ষণ করে তাদের ধর্ম নাশ করা হয়েছে। হাজার হাজার হিন্দুকে জোর করে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে। 'হয় মুসলমান ধর্ম গ্রহণ কর, নয়তো মৃত্যুকে বরণ কর'— এই ছিল নিদান। মৌলবিরা এসে 'কলমা' পরাত, কোরান পাঠ করাত। মুসলমান হওয়ার প্রমাণ হিসাবে হিন্দু পুরুষদের গোহত্যা করতে এবং গোমাংস খেতে বাধ্য করা হয়েছিল। রাজি না হলে হত্যা করা হতো। মুসলিম লিগ নেতাদের অনুমতি ছাড়া গ্রামের বাইরে যাওয়া নিষেধ করা হলো; বাইরে থেকে বিশিষ্ট কেউ খোঁজ নিতে এলে বলতে হতো 'নিজের ইচ্ছায় মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছি'। এমনকী সাক্ষী সাবুদের সই-সহ আগের হিন্দু নাম পালটে নতুন মুসলমান নাম গ্রহণের স্বেচ্ছা অঙ্গীকারপত্র নোটিশ দিয়ে পাবলিক প্লেসে টাঙিয়ে দিতে হতো। অবাধ্য হলে জুটতো মার। বেশি অবাধ্য হলে হত্যা করা হতো। খবরের কাগজের উপরও নিষেধাজ্ঞা জারি করা ছিল, কাজেই বাকি দুনিয়ার লোকেরা বেশ কয়েকদিন জানতেই পারেনি নোয়াখালির হিন্দুদের এই গণহত্যার, ধর্মান্তরকরণের খবর। প্রায় ১১ দিন ধরে চলেছিল মুসলিম জিহাদিদের এই নারকীয় পৈশাচিক তাণ্ডব।

আগস্টে কলতায় হিন্দু হত্যার সময় গান্ধীজী নিষ্ক্রিয় ছিলেন অন্তরাত্মা সাড়া দেয়নি বলে। এবার অবশ্য এই ভয়াবহ খবর জানতে পেরে ১৯৪৬ সালের ৬ নভেম্বর গান্ধীজী কলকাতা হয়ে নোয়াখালি রওনা দিলেন এবং ১৯৪৭ সালে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত নোয়াখালির বিভিন্ন জায়গা ঘুরে হিন্দুদের মনোবল বাড়াবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় হলো, কোনও জায়গাতেই তিনি মুসলমানদের এই কাজের নিন্দা করেননি। বরঞ্চ তিনি হিন্দুদের নানারকম উপদেশ দিতেন। শ্রীমতী অশোকা গুপ্তা গান্ধীজীর সহযাত্রী ছিলেন। তাঁর লেখা থেকে জানা যায়, গান্ধীজী হিন্দুদের বলতেন— ''মনের মধ্যে কোনও বিদ্বেষ ভাব রেখ না। নির্ভয়ে কাজকর্ম করে যাও। গ্রামবাসীদের সঙ্গে মিলে মিশে থাক। সম্পূর্ণ নির্ভয়ে সত্যের পথে থাক। সত্যের পথে থাকলে এবং তোমাদের নির্ভীক দেখলে দাঙ্গাবাজরা তোমাদের শ্রদ্ধা করবে''। যাদের ঘরের মেয়েদের মুসলমান জিহাদিরা ধর্ষণ করেছে, যাদের মেয়েদের জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে মুসলমান ছেলেকে বিয়ে করতে বাধ্য করা হয়েছে, যাদের বাপ-ভাইকে জিহাদিরা হত্যা করেছে, যাদের মন্দিরের দেব-দেবীকে ভেঙেচুরে ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাদের গোমাতাকে জবাই করে গোমাংস খেতে বাধ্য করা হয়েছে, তাদের কানে গান্ধীজীর এই প্রেমের বাণী কত মধুর লেগেছিল, কত গ্রহণীয় হয়েছিল কে জানে!

হাজার হাজার ধর্মান্তরিত হিন্দুকে স্বধর্মে ফিরিয়ে এনে তাদের গ্লানিমুক্ত করেছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ। এই খবর আমরা কতজন রাখি? আত্মবিস্মৃত বাঙালি হিন্দুরা কি ইতিহাস থেকে কোনও শিক্ষাই নেবে না?

নোয়াখালির দাঙ্গার খবর পেয়ে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি সেখানে ছুটে গিয়ে হিন্দুদের পাশে দাঁড়ালেন। হিন্দুমহাসভার পক্ষ থেকে সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দিলেন। আর একটি দৃষ্টান্তমূলক কাজ তিনি করেছিলেন, যা করার হিম্মত তখনকার পটভূমিকায় একমাত্র ড. শ্যামাপ্রসাদেরই ছিল। একটি হিসাব থেকে জানা যায়, নোয়াখালির পার্শ্ববর্তী ত্রিপুরাতে প্রায় দশ হাজার হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করা হয়েছিল; নোয়াখালিতে হয়েছিল আরও বেশি। এই ধর্মান্তরিত হিন্দুদের অবস্থা হয়েছিল--- মুসলমানদের খোঁয়াড়ে বন্দি গোরু-ছাগলের মতো। ড. শ্যামাপ্রসাদ এই বিপুল পরিমাণ ধর্মান্তরিত হিন্দুদের সসম্মানে পুনরায় হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনার কঠিন কাজটি করেছিলেন। মুসলমান জিহাদিদের থাবা থেকে বের করে এনে গোঁড়া হিন্দুদের নানারকম কঠোর সংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করে এই কাজটি করা একজন রাজনৈতিক লোকের পক্ষে কত কঠিন তা সহজেই অনুমেয়। ড. শ্যামাপ্রসাদ তা সম্ভব করেছিলেন।

ড. শ্যামাপ্রসাদ বলেছিলেন— ''আমাদের বহু সহস্র ভ্রাতা-ভগিনি এইভাবে নতিস্বীকারে বাধ্য হইয়া হিন্দু সমাজের গণ্ডীর বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন বলিয়া আমি মনে করিতে পারি না। তাঁহারা হিন্দু ছিলেন, তাঁহারা এখন হিন্দু এবং তাঁহারা আমরণ হিন্দু থাকিবেন। প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে— কোনও ব্যক্তিই এরূপ কথা তুলিতে পারিবেন না। এই নির্দেশের বহুল প্রচার করিতে হইবে। প্রায়শ্চিত্তের কথা উঠিতেই পারিবে না। যখনই কোনও মহিলাকে উপদ্রুত অঞ্চল হইতে উদ্ধার করা হইবে, বলপূর্বক তাঁহাকে বিবাহ করা হইলেও তিনি বিনা বাধায় স্বীয় পরিবারে ফিরিয়া যাইবেন। যে সকল কুমারীকে উদ্ধার করা হইবে, যতদূর সম্ভব তাহাদিগকে বিবাহ দিতে হইবে''।

ড. শ্যামাপ্রসাদ হিন্দু ধর্মের যত বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান আছে, যত বড় বড় ধর্মগুরু আছেন যেমন— রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, নবদ্বীপ সমাজ, ভট্টপল্লী সমাজ, বকলা সমাজ, বিক্রমপুর সমাজ, সংস্কৃত সমাজ, কাশীর পণ্ডিতসভা, মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী, কাঞ্চীর শঙ্করাচার্য, গোবর্ধন মঠের (পুরী) স্বামী যোগেশ্বরানন্দতীর্থ— সবার কাছে গেলেন, আবেদন করলেন এইসব হতভাগ্য হিন্দু যাঁরা প্রাণের ভয়ে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন তাঁরা যেন পুনরায় সসম্মানে হিন্দু ধর্মে ফিরে আসতে পারেন— তার ধর্মীয় নিদান যেন তাঁরা দান করেন। ড. শ্যামাপ্রসাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে এই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি এবং ধর্মগুরুরা কুসংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠে এই হতভাগ্যদের স্বধর্মে ফিরে আসার বিধান দিয়ে হিন্দুধর্মের উদারতা ও মহত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এই বিধান বুকলেট আকারে ছেপে তাতে সই করে প্রচার করেন রামকৃষ্ণ মিশনের তৎকালীন অধ্যক্ষ স্বামী মাধবানন্দ মহারাজ। এইভাবে হাজার হাজার ধর্মান্তরিত হিন্দুকে স্বধর্মে ফিরিয়ে এনে তাদের গ্লানিমুক্ত করেছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ। এই খবর আমরা কতজন রাখি? আত্মবিস্মৃত বাঙালি হিন্দুরা কি ইতিহাস থেকে কোনও শিক্ষাই নেবে না? ■

বাংলা সম্বন্ধে গোখলের মন্তব্য এখন উপহাস মাত্র

কে. এন. মণ্ডল

> পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে তিনটি বিদেশি রাষ্ট্রের সীমানা হওয়ায় রাজ্যটি আরো বেশি স্পর্শকাতর। রাজ্যে অবৈধ অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে রাজ্য তথা ভারত রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা, সার্বভৌমত্ব এবং নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার আন্তর্জাতিক প্রয়াস অব্যাহত। এমতাবস্থায়, ক্ষমতার লোভে অবৈধ অনুপ্রবেশে উৎসাহ বা প্রশ্রয় দেওয়া দেশের স্বার্থের পরিপন্থী এবং রাজ্যবাসীর জন্য আত্মঘাতী।

১৯০৫ সালে ব্রিটিশ সরকারের প্রশাসনিক সুবিধার কারণ দেখিয়ে বাংলা ভাগের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মধ্যবিত্ত বাঙালি তথা বাঙালি বুদ্ধিজীবী, কবি সাহিত্যিক এবং স্বদেশীপন্থীদের তীব্র আন্দোলনের ফলে ১৯১১ সালে ব্রিটিশ সরকার বাধ্য হয় বাংলা ভাগের সিদ্ধান্ত রদ করতে। এভাবে বিভক্ত বাংলামায়ের অঙ্গের পুনঃস্থাপন হলেও রক্তক্ষরণ কিন্তু বন্ধ হয়নি। কারণ, রবীন্দ্রনাথের মতো বিশিষ্টজনেরা রাখিবন্ধনের মাধ্যমে 'বাঙালি ভাই-বোনেরা এক হও' বললেও, হাতে গোনা কয়েকজন মূলস্রোতের মুসলমান বুদ্ধিজীবী ছাড়া বাংলার মুসলমানরা বঙ্গভঙ্গ রদের আন্দোলন থেকে নিজেদের দূরে রাখে। বরং বাংলাকে ভাগ করা যায় এই বোধ তাদের চেতনাকে নাড়া দিয়ে পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখায়। নেতাজী সুভাষ, মহাত্মা গান্ধী বা হিন্দু মহাসভার নেতারা যতই অখণ্ড ভারতের কীর্তন করুন— মুসলমান মানসে জাগরুক ছিল আলাদা স্বাধীন দেশ। মহাত্মার খিলাফত আন্দোলনকে সমর্থনও মুসলমানদের মন ভেজাল না। মুসলমান শাসনের ইতিহাস (কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া) কখনোই সহাবস্থানের ইতিহাস নয়— তাদের ইতিহাস বিভাজনের, অত্যাচারের। মন্দির ধ্বংস, ধর্মান্তরকরণ এবং হিন্দু নারীদের প্রতি লোলুপতা— ভারতবর্ষে হাজার বছরের মুসলমান শাসনের ভারতীয় অভিজ্ঞতা।

সুরাবর্দি সাহেব অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন তার এবং মুসলিম লিগের প্রত্যক্ষ মদতে ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট জুম্মাবারে ডাইরেক্ট অ্যাকশনের নামে কুখ্যাত ক্যালকাটা কিলিংস্ এবং ওই বছরের ১০ অক্টোবর নোয়াখালি জেনোসাইড হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির রাজনীতিতে (যা যুগ যুগ সতর্ক লালনে অর্জিত হয়েছিল) শেষ পেরেকটি পুঁতে দেয়— যার ফলশ্রুতিতে দেশভাগ অনিবার্য হয়ে ওঠে। ১৯৪৭-এর দেশভাগের আঘাত এতই তীব্র ছিল যা আজও সম্পূর্ণ প্রশমিত হয়নি। পূর্ববঙ্গের হিন্দু বাঙালিরা জনসংখ্যার নিরিখে সংখ্যালঘু থাকলেও শিক্ষা, সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে মুসলমানদের থেকে অনেক এগিয়ে ছিলেন। অথচ, ব্রিটিশের প্ররোচনায় এবং জিন্নাহ্‌র বিভেদ ও বিদ্বেষপ্রসূত রাজনীতির ফলে দেশভাগ হওয়ায় ঢাকার বাঙালি এবং কলকাতার বাঙালিদের মধ্যে অসম অবস্থান তৈরি হলো— একজন আশ্রয় দাতা, অন্যজন আশ্রয়প্রার্থী। আর এও সম্ভব হয়েছে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির দূরদৃষ্টির ফলে। তার চাপের ফলেই ১৯৪৬-এর ২০ জুন Bengal Legislative Assembly-তে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে বাংলা ভাগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়— হিন্দু বাঙালিদের আশ্রয়স্থল হিসাবে পরাজিত হয় সুরাবর্দি- শরৎ বসুদের সার্বভৌম বাংলার দাবি। সাময়িকভাবে হলেও পশ্চিমবঙ্গবাসী রক্ষা পেল পূর্ব বাংলার হিন্দুদের বা কাশ্মিরি পণ্ডিতদের মতো পৈতৃক ভিটা থেকে বিতাড়নের হাত হতে। মুসলমান গরিষ্ঠ কোনও দেশ বা প্রদেশে অমুসলিমদের অবস্থা কি বর্ণনার অপেক্ষা রাখে?

পূর্ববঙ্গে ফেলে আসা ভাইবোনেরা, আত্মীয়স্বজনেরা কেমন আছেন, কোথায় আছেন বা আদৌ আছেন কিনা, তা জানতে সম্প্রতি প্রকাশিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রধান ড. আবুল বরকতের গবেষণামূলক গ্রন্থে চোখ রাখতে হবে। যার মর্ম এই যে, 'বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর ২.৫ লাখ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ হারিয়ে যাচ্ছেন। এভাবে চলতে থাকলে ৩০ বছরের মধ্যে বাংলাদেশ হিন্দু শূন্য হয়ে যাবে।' একই সতর্কবাণী রয়েছে এই নিবন্ধকারের লেখা 'বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের ভবিতব্য' বইয়ে, যা প্রকাশিত হয়েছে ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকার বইমেলায়। এই বইটির ইংরেজি সংস্করণ 'Destiny of Bengladeshi Minorities'-এর আচরণ

উন্মোচন করেছেন হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সম্মানীয় চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায় ২০১৩ সালের ২৯ জুলাই কলকাতা প্রেস ক্লাবে।

দেশভাগের ফলে ভারতের রাজনীতির আঙ্গিনায় বাঙালিদের যে পশ্চাদপসরণ শুরু হয়েছিল তার ধারাবাহিকতা আজও চলছে। আমরা পশ্চিমবঙ্গ বসে যতই আত্মগরিমার ফানুস উড়াই না কেন, অবশিষ্ট ভারতে তার কোনও গুরুত্ব নেই। মহামতি গোখলের বক্তব্য (বাংলা আজ যা ভাবছে— অবশিষ্ট ভারত তা আগামীতে ভাববে) এখন রসিকতার ছলে উচ্চারিত হয়। আশির দশকের একটি ঘটনার উল্লেখ এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক— এই লেখক বোম্বের (অধুনা মুম্বাই) একটি সেমিনার কক্ষে ছিলেন, হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে যায়, মঞ্চের বক্তা পরিহাস ছলে (উপস্থিত ৩/৪ জন বাঙালি সভাকক্ষে) বললেন, What Bengal thinks today, rest of India thinks tomorrow'। উল্লেখ্য, আশির দশকে পশ্চিমবঙ্গ প্রচণ্ড বিদ্যুৎ ঘাটতির কবলে ছিল।'

পশ্চিমবাংলা ও বাঙালির এই অবনমন ক্ষমতালোভী অপরিণামদর্শী রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরা ত্বরান্বিত করে রাজ্যটিকে এক সংকটের দিকে এগিয়ে দিচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ আজ আন্তর্জাতিক চক্রান্তের শিকার। মৌলবাদীদের জেহাদের উর্বর ভূমি পশ্চিমবাংলার খাগড়াগড়, কালিয়াচক, দেগঙ্গা বা বসিরহাটের ঘটনাই তার টাটকা উদাহরণ। শোনা যাচ্ছে আই এস আই এস-এর বৃহত্তর পরিকল্পনা রয়েছে অসমের কয়েকটি জেলা এবং পশ্চিমবঙ্গের বাংলাদেশ ঘেঁষা কয়েকটি জেলাকে নিয়ে। বাংলাদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ মুসলমান অনুপ্রবেশ এবং নানা ক্ষমতাসীন দল দ্বারা তাদের মূলস্রোতে অন্তর্ভুক্তি, সীমান্ত জেলাগুলির জনসংখ্যার ভারসাম্য ব্যাপকভাবে বিঘ্নিত করেছে। ইতিমধ্যেই ২/৩টি জেলা মুসলমান গরিষ্ঠ হয়েছে এবং আরও ২/৩টি জেলা সেদিকে পা বাড়াচ্ছে। ফলে, সীমান্ত জেলাগুলিতে গোরুপাচার, চোরাচালান, জালনোটের কারবারিদের অবাধ আশ্রয়স্থল তৈরি হয়েছে। পরিস্থিতি আরো জটিল হয়েছে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের অনুপ্রবেশ এবং তাদের আশ্রয়দানে মুখ্যমন্ত্রীর উদাত্ত আহ্বানে। ইতিমধ্যেই রোহিঙ্গাদের কেউ কেউ পাকিস্তানি সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে জড়িত হয়ে নাশকতার কাজে যুক্ত। অনুমেয়, মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণার পিছনে যত না মানবিক মুখ, তার থেকে অনেক বেশি ভোট ব্যাঙ্ক তৈরির চিন্তা এবং হিন্দু মুসলমানের মেরুকরণ করে বামফ্রন্টের ৩৪ বছরের রেকর্ড ভাঙ্গা।

অসমে এন আর সি বা নাগরিকপঞ্জী প্রকাশের প্রথম পর্যায় অনেক বাঙালির নাম না থাকার অসন্তোষকে কাজে লাগিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ফের মাঠে অবতীর্ণ। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় একজন দায়িত্বশীল প্রশাসকের ভূমিকা ভুলে গিয়ে তিনি ঘোষণা করলেন— অসমে বাঙালিদের বিতাড়িত করলে তারা পশ্চিমবঙ্গে স্বাগত। এ ব্যাপারে তিনি ইতিমধ্যেই জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারের জেলা কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনে আশ্রয় শিবির খোলার নির্দেশ দিয়েছেন। অসমে যে অ-মুসলমানদের বিতাড়ন সম্ভব নয় মুখ্যমন্ত্রী তা জানেন। কেননা ভারত সরকার ২০১৫ সালের ৭ সেপ্টেম্বর এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে বাংলাদেশ ও পাকিস্তান থেকে ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারতে আগত অ-মুসলমানদের ভারতে বসবাস বৈধ ঘোষণা করেছে। শুধু তাই নয়, ওই সমস্ত মানুষজনকে নাগরিকত্ব প্রদানের বিলও পেশ হয়েছে লোকসভায়। প্রসঙ্গত তৃণমূল হিন্দু বাঙালিদের নাগরিকত্ব বিলের বিরোধিতা করছে অতএব মুখ্যমন্ত্রীর লক্ষ্য, মুসলমান ভোট ব্যাঙ্ক তথা অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা, নির্বোধেরাও তা বুঝতে পারেন।

সাম্প্রতিককালে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ভিন প্রদেশে কাজ করতে যাওয়া কয়েকজন শ্রমিক নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন মালদার আফরাজুল, বাঁকুড়ার হেমন্ত রায় এবং ডোমজুড়ের ঠাকুরদাস মাজি। যে রাজ্যে এরা নিহত হয়েছে সেগুলি হচ্ছে যথাক্রমে রাজস্থান, কেরল এবং দিল্লি। রাজস্থান বাদে দুটি রাজ্যেই বিরোধীদের সরকার এবং বিষয়টি একান্তই আইনশৃঙ্খলা জনিত। ব্যক্তিগত শত্রুতা বা অন্য কোনও কারণে খুন হওয়া ছাড়া এই ব্যক্তিদের খুনের পিছনে কোনো সংগঠিত গোষ্ঠীর হাত আছে এমন কোনও খবর এখনো নেই। অথচ আফরাজুলের খুন হওয়ার পরে পশ্চিমবঙ্গের একটি রাজনৈতিক দল এবং সরকারের উদ্যোগে যে কুনাট্য সংগঠিত করলো তা নিন্দনীয়— যেমন নিন্দনীয় খুনের ঘটনাটি। পশ্চিমবঙ্গ থেকে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে, এমনকি উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলিতে কাজের খোঁজে যাচ্ছেন, পশ্চিমবঙ্গে কাজের সুযোগ নেই বলে। মেরুকরণের রাজনীতি না করে পশ্চিমবঙ্গে কাজের সুযোগ তৈরি এবং রুজি-রুটির ব্যবস্থা হলে— কে যাবে ঝুঁকি নিয়ে অচেনা পরিবেশে।

মনে রাখতে হবে, দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগের ফলশ্রুতিতে ঐতিহাসিক কারণেই পশ্চিমবঙ্গ জনবিস্ফোরণের শিকার। রাজ্যের সঙ্গে তিনটি বিদেশি রাষ্ট্রের সীমানা হওয়ায় রাজ্যটি আরো বেশি স্পর্শকাতর। রাজ্যে অবৈধ অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে রাজ্য তথা ভারত রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা, সার্বভৌমত্ব এবং নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার আন্তর্জাতিক প্রয়াস অব্যাহত। এমতাবস্থায়, ক্ষমতার লোভে অবৈধ অনুপ্রবেশে উৎসাহ বা প্রশ্রয় দেওয়া দেশের স্বার্থের পরিপন্থী এবং রাজ্যবাসীর জন্য আত্মঘাতী।

(লেখক ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কের অবসরপ্রাপ্ত মুখ্য প্রবন্ধক)

গো-গ্রাম বিকাশ কার্যকর্তা প্রশিক্ষণ বর্গ

দিনাঙ্ক : ৭ সেপ্টেম্বর দুপুর ১২টা থেকে ১১ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টা পর্যন্ত।

স্থান : কামধেনু গোশালা

সোদপুর, উ: ২৪ পরগনা

বর্গের বিষয় :

১. গো-ভিত্তিক চাষ, ২. গো-ভিত্তিক উর্জা, ৩. গো-ভিত্তিক মানব চিকিৎসা, ৪. গো এবং কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ উদ্যোগ, ৫. গো-সংরক্ষণ এবং ভারতীয় গো-প্রজাতির উন্নয়ন।

শুল্ক : ১০০/-

যোগাযোগ : গদাধর দা।

মোবাইল : ৯৬৭৯১৫৫৪৩১

আমিও গেরুয়াধারী হিন্দু

গত ২৮ জুলাই মেদিনীপুরে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, ''আমি গেরুয়াধারী হিন্দু। স্বামী বিবেকানন্দের হিন্দুত্বে বিশ্বাস করি।'' তাঁর আরও বক্তব্য, 'গত চার বছরে বিজেপি হিন্দুদের জন্য কিছুই করেনি। যাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর নিন্দা করে বলেন, তিনি শুধু সংখ্যালঘু তোষণ করেন, তাঁদের জানা উচিত, তিনি হিন্দুদের জন্য যা করেছেন, কোনও মুখ্যমন্ত্রী তা করেননি। ইমাম, মোয়াজ্জেমদের ভাতা দেওয়ার পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দুদের জন্য অনেক কাজ করেছেন। গঙ্গাসাগরের মেলা থেকে শুরু করে দক্ষিণেশ্বর স্কাইওয়াক, তারকেশ্বরের আমূল পরিবর্তন ও দুর্গাপূজাকে রেডরোডের রাস্তায় কার্নিভ্যালের রূপ দেওয়ার মতো বিভিন্ন কাজ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।'

হিন্দুদের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কী কী কাজ করেছেন তার কিছু ফিরিস্তি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দিলেও সবটা দেননি। যে কাজগুলির ফিরিস্তি তিনি দেননি সেগুলি আমি তুলে দিচ্ছি। যেমন— মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুলিশ দিয়ে রামনবমীর মিছিলে হিন্দুদের লাঠিপেটা করেছেন। ২০১৬ সালে মহরম উপলক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রীর সরকার মুসলমানদের খুশি করতে দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জন বন্ধ করে দিয়েছে, ২০১৭ সালে হাওড়া জেলার তেহট্ট হাইস্কুলে স্কুলছাত্রী প্রিয়া বাগ প্রতিবাদ করে। তার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর পুলিশ প্রিয়া বাগকে লাঠিপেটা করে মাথা ফাটিয়ে রক্ত ঝরিয়ে দিয়েছে। এরকম আরও অনেক কিছু হিন্দুদের মুখ্যমন্ত্রী দিয়েছেন।

অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী মুসলমানদের আরও যা যা দিয়েছেন তার ছিটেফোঁটাও হিন্দুদের যে দেননি তারও তালিকা তুলে দিলাম খবরের কাগজ থেকে। মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছেন— রাজ্যের ১ কোটি ৭০ লক্ষ সংখ্যালঘু পড়ুয়াকে স্কলারশিপ দেওয়া হয়েছে। পাঁচ লক্ষ সংখ্যালঘু বেকারকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে মেয়াদি ঋণ দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের সাধারণ মানুষকে কর্মোপযোগী করে তুলতে ৬০ হাজার যুবক-যুবতীকে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রায় ৬৯ হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে উচ্চ শিক্ষায় সংরক্ষণের অধীনে আনা হয়েছে। গীতাঞ্জলি, নিজভূমি-নিজ গৃহ-সহ আরও একাধিক প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের ১ লক্ষ ৩১ হাজার সংখ্যালঘু মানুষকে বাড়ি বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও জেলায় জেলায় ১৮৩টি মার্কেটিং হাব তৈরি হচ্ছে, যেখানে আগামী দিনে প্রায় ২৯ হাজার সংখ্যালঘু শ্রেণীর মানুষ দোকান পাবেন। রাজ্যজুড়ে ২৫৯৭টি কবরস্থান চিহ্নিত করা হয়েছে, যেগুলি রাজ্যসরকার পাঁচিল দিয়ে ঘিরে দেবে ইত্যাদি। (বর্তমান, ২.৮.১৬ পৃ. পাঁচ)। কিন্তু এগুলির মধ্যে একটিও হিন্দুদের কপালে জোটেনি। রাজারহাট এলাকায় মুসলমানদের জন্য বিশাল এবং বিলাসবহুল হজহাউস তৈরি হলেও গঙ্গাসাগর মেলায় যাওয়ার সময় হিন্দুদের জন্য কোনও চালাঘরও তৈরি হয় না। মুখ্যমন্ত্রী সন্ত্রাসবাদী তৈরির কারখানা স্বরূপ ১০ হাজার খারিজি মাদ্রাসাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। পক্ষান্তরে রাজ্যের সংস্কৃত টোলগুলি যাতে বন্ধ হয়ে যায় তার সুব্যবস্থা করেছেন।

এই ধর্মনিরপেক্ষীদের হিন্দু এবং ভগবান শ্রীরামপদে মাথা ঠোকা দেখে আমার খুব আশঙ্কা হচ্ছে এই ভেবে যে, ধর্মনিরপেক্ষীরা যদি সবাই শ্রীরামপদে মাথা ঠোকেন তা হলে আল্লার বান্দাদের পায়ে তেল মালিশ করবে কে?

—সাতকড়ি শর্মা,
মালদা।

'ঊনিশের সুযোগ সন্ধানী জোট'

বর্তমানে নরেন্দ্র মোদীকে হঠাতে কেন্দ্রে একটি বিকল্প জোট তৈরি হয়েছে। তাতে কে প্রধানমন্ত্রীর কুরসিতে বসবে কিছুতেই ঠিক হচ্ছে না। কারণ বেশির ভাগ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরই ইচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়া। কিন্তু সে কথা আগে থেকে কেউ নিজে মুখে বলছে না। পরিণাম কী হবে তা তো সবার জানা। তবে একথা সত্য সবাই যার যার নিজের রাজ্যে কাউকে ভাগ দিতে ইচ্ছুক নয়। ভাগ দিলে সংখ্যার নিরিখে ঘাটতি দেখা দেবে

একথা সবাই জানে। আপাতত ঠিক হয়েছে রাহুলবাবুর নেতৃত্বে জোট চলবে। নেতৃত্ব দিলেই প্রধানমন্ত্রী বলে সবাই মানবে তা কিন্তু ঠিক নয়। কথায় আছে গায়ে মানে না আপনি মোড়ল। এ প্রসঙ্গে আমি একটা মোক্ষম উদাহরণ দিয়েই শেষ করব আমার পত্র। ১৭ বছর আগে আমাদের দুটি দুধের গোরু ছিল। তাদেরকে প্রতিদিন রান্না করা কিছু খাবারের অংশ দেওয়া হতো। খাবার দেওয়ার আগে গোরু দুটির গলার দড়ি খুলে দেওয়া হতো। কিছুটা চওড়া জায়গায় খাবার ছড়িয়ে দিলে গোরু দুটি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে খাওয়া শুরু করত। কিন্তু গোরুদের একটা নিজস্ব নিয়ম ছিল। দুজনেই নিজের সামনের দিকে বেশিটা খাবার আটকে রেখে খাওয়া শুরু করত। ভাবত বিপরীত দিকটা আগে শেষ করি। বাকিটা তো আমার আওতার মধ্যেই আছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যেত খাবার দু'দিক থেকেই শেষ। আমাদের বর্তমান জোট সরকারের ওই একই দশা।

—স্বপন কুমার ভৌমিক,
শান্তিপুর, নদীয়া।

শরিয়া আদালত চালুর উদ্যোগ

আবার আমরা শুনতে পাচ্ছি সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে দেশভাগের পদধ্বনি। এদেশের একশ্রেণীর চক্রান্তকারী, দ্বিজাতি তত্ত্বে বিশ্বাসী ও বিভাজনকামী মুসলমান এদেশের প্রতি জেলায় শরিয়তি আদালত (দারুল কাজা) চালু করে ইসলামিক আইনে মুসলমান সমাজের সব সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হয়েছেন। অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড মূলত এই উদ্যোগের উদ্যোক্তা--- যাঁদের মধ্যে জাফরিয়ার দিলানি অন্যতম। উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্য যে ভারতের মুসলমান সমাজকে মূলস্রোত থেকে সরিয়ে নেওয়া তাতে নেই

কোনও সন্দেহ। জিন্না দ্বিজাতি তত্ত্ব (হিন্দু-মুসলমান এক জাতি নয়) খাড়া করে এবং প্রত্যক্ষ সংগ্রামের (কলকাতা, নোয়াখালি, লাহোরে হিন্দু- শিখ নিধন) মাধ্যমে হাসিল করেছিলেন ভারত ভেঙে পাকিস্তান। তবে কী মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ডও সেই পথে হাঁটছে? সন্দেহ এই কারণে যে, গণতান্ত্রিক ভারতে নিরপেক্ষ আইন-আদালত থাকা সত্ত্বেও ওই ইসলামিক সংগঠন কেন মুসলমানদের জন্য পৃথক শরিয়া আদালত খুলে বিচারের ব্যবস্থা করতে চাইছে? তবে কি তাদের ভারতের বিচার ব্যবস্থার উপর কোনও আস্থা বা বিশ্বাস নেই? আর তাই কি ইসলামিক আদালত চালু করার এহেন চিন্তা ভাবনা?

ভারত গণতান্ত্রিক দেশ। সংবিধানেও রয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা। তাছাড়া আইনের দৃষ্টিতেও সবাই সমান। তবুও কেন ওই ল' বোর্ডের এই সাম্প্রদায়িক ভাবনা? মুসলিম ব্যক্তিগত আইনকে হাতিয়ার করে এই বিভাজনের রাজনীতি করা? আমরা অনেকেই জানি, ইসলামিক আইনে ব্যভিচারের শাস্তি মাটিতে অর্ধেক পুতে অপরাধীকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করা, খুনি হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান, চুরির অপরাধে হাত কেটে দেওয়া ইত্যাদি। তাই ল' বোর্ডের নেতৃত্বের কাছে প্রশ্ন, শরিয়তি আদালত চালু হলে ওই সব শাস্তি দোষীরা পাবে তো? নাকি গুরু পাপে লঘু দণ্ড পাবে?

তবে কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে যে মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ডের শরিয়া আদালত চালু করার কোনও ক্ষমতা নেই। আইনমন্ত্রীও সাফ বলেছেন, মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ডের ওই উদ্যোগকে সরকার মোটেই সমর্থন করে না। তবে সরকার পক্ষ যাই বলুক না কেন, বোডকর্তারা সে কথায় যে কান দেবেন না তা বলাই বাহুল্য। কারণ এই উদ্যোগের 'মাস্টারমাইন্ড' যে ওই ল' বোর্ড তা নয়, এর পেছনে রয়েছে রাজনৈতিক রাঘববোয়াল তথা মোদী-বিরোধী বহু সংখ্যালঘু তোষণকারী দলের মদত। 'তিন তালাক' বন্ধে যাঁরা অখুশি, যাঁরা চান না মুসলমান নারীদের অধিকার ও স্বাধীনতা এবং যাঁরা চান আগামী নির্বাচনে মোদী সরকারের পতন, তাঁরাই ইন্ধন জোগাচ্ছেন ওই বোর্ডকে— যাতে ভারত ফিরে যায় মধ্যযুগে। আসলে মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড ও তাদের মদতদাতারা দেশবাসীকে দেখাতে চাইছেন, মোদীর শাসনে ভারতে সংখ্যালঘুরা সুরক্ষিত নয়, নাগরিক অধিকার ও ন্যায় বিচার থেকে তারা বঞ্চিত। এ এক বিশাল চক্রান্ত। মোদী হটাতে আজ সেকু, মাকু ও ইসলামিক বিচ্ছিন্নতাবাদীরা এক জোট হয়েছে। তাই আজ যাঁরা শরিয়তি আদালত চালুর উদ্যোগ নিয়েছেন তাঁদের জেনে রাখা উচিত, ইসলমিক পাকিস্তান-সহ বহু মুসলিম দেশে শরিয়া আদালত বা 'দারুল কাজা'র কোনও অস্তিত্ব নেই। সত্যি বলতে কী, ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হলেও তার সংবিধানে ঢোকানো হয়েছে মুসলিম ব্যক্তিগত আইন ও ৩৭০ ধারার ন্যায় বিতর্কিত বিষয়, যা বিশ্বে বিরল। ইসলামের ধ্বজাধারীরা নিঃসন্দেহে মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের ক্ষমতা বলে শরিয়া আদালত ও বিচার ব্যবস্থা চালুর এই উদ্যোগ নিয়েছেন। তাই প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ ভারত সৃষ্টির স্বার্থে সংবিধান থেকে ওই দুটি বিতর্কিত ধারার বিলুপ্তি ঘটানো একান্ত জরুরি। প্রায় ছয় দশকের ক্ষমতাভোগীরা ক্ষমতা হারিয়ে চক্রান্তের মাধ্যমে পুনরায় ক্ষমতা দখলে আজ মরিয়া।

—ধীরেন দেবনাথ,
কল্যাণী, নদীয়া।

প্রতিবেশীর ধর্ম, সংস্কৃতি, ইতিহাস জানতে হবে

যখনই কোনও সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতি দেখা দেয় তখনই শান্তির ললিতবাণী শোনাতে ঝাঁপিয়ে পড়েন বুদ্ধিজীবীগণ। প্রবন্ধকারেরা সাম্প্রদায়িক যুক্তিজাল রচনা করে পত্রিকার পাতা ভরে ফেলেন। তথাকথিত কবিরা সমাধানের কবিতা লিখতে লিখতে কেশদাম শুভ্র করে ফেলেন। গল্পকারেরা মিলনের গল্প পড়ে পড়ে হাততালি কুড়ান। রাজনীতিবিদেরা দরদে অশ্রুর নদী বইয়ে দেন। প্রশাসন কমিশন গঠন করেন, জনতা মোমবাতি মিছিল করে মোমবাতির আকাল সৃষ্টি করে, কিন্তু সমস্যা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই থেকে যায়। না হলে কেন উভয় সম্প্রদায় শত শত বছর এক সঙ্গে বাস করার পরেও আমাদের দেখতে হলো— কলকাতা, নোয়াখালি, বিহার, ঢাকা, বরিশাল, যশোর, ত্রিপুরা, পঞ্জাব, বেলুচিস্থান, লাহোর এবং বর্তমানে ধুলাগড়, বসিরহাট, দেগঙ্গার দাঙ্গা? কেন ধর্মব্যবসায়ীদের হাতে আজও খুন হতে হয় অভিজিৎ রায়, ওয়াশিকুর রহমানবাবু, অনন্ত বিজয় দাস, নিলয় নীল, যজ্ঞেশ্বর রায়, নিত্যরঞ্জন পাণ্ডে, মহম্মদ আখলাক, জুনেইদ খানদের? এর অন্তর্নিহিত কারণগুলো খুঁজে বের করে যদি তার সমাধান না করা হয় তাহলে লাখো মোমবাতি জ্বলে জ্বলে নিভে যাবে, হাজার হাজার লেখা বাজে কাগজ হয়ে আস্তাকুঁড়ে পড়ে রবে, লাখো লাখো বক্তব্য বৃথা শব্দ হয়ে হাওয়ায় ভেসে যাবে, কোটি কোটি নির্যাতিতের চোখের জলে সমুদ্রের জল আরো লবণাক্ত হবে কিন্তু সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান আসবে না।

আজও সামান্য সাম্প্রদায়িক গণ্ডগোলে প্রতিবেশী একজন আর একজনের গলায় ছুরি ধরতে হাত কাঁপে না। তাদের বৌ মেয়েকে ধর্ষণ করতে বিবেকে আটকায় না। তাহলে আমরা যে এতকাল লাখাবার ''একই বৃন্তে দু'টি কুসুম হিন্দু মুসলমান'' গেয়েছি সবই কি বৃথা হয়ে গেছে? সম্পূর্ণ বৃথা না হলেও সার্থকও হয়নি। কারণ আমরাও সঠিক দায়িত্ব পালন করিনি। আমরা ইথিওপিয়া ভিয়েতনাম কাম্বুচিয়া নিয়ে গলা ফাটিয়েছি কিন্তু বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে কেন সে দেশের হিন্দুরা চৌদ্দ পুরুষের ভিটামাটি ছেড়ে ভারতে রেললাইনের ধারে বাস করতে বাধ্য হচ্ছে সে ব্যাপারে একটা কথাও বলেনি। বলিনি যখন ভারতের সংখ্যালঘুরা সংখ্যালগুরুদের অনেক স্কুলে সরস্বতী পুজো বন্ধ করেছে, মৃতদেহ নিয়ে তাদের গ্রামে হরিবোল বলতে দেয়নি, অথচ মাইকে আজানের ধ্বনি বিভিন্ন গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, ''আমাদের প্রত্যেকের উচিত প্রতিবেশীর ধর্ম ইতিহাস সংস্কৃতিকে জানা।'' তাতে কোনও বৈরিতা থাকলে আলোচনার মাধ্যমে সেটা চিরতরে দূর করে দেওয়া। তাহলেই শান্তি আসবে। ঘায়ে শুধু মলম লাগানো নয়, আজ ঘা সারাতে হবে।

—কিশোর বিশ্বাস,
আনন্দবাগান, হৃদয়পুর,
কলকাতা-১২৭।

পারিবারিক হিংসার বিরুদ্ধে মেয়েরা কীভাবে লড়বেন

সৌমী দাঁ

আমাদের সমাজে মহিলারা, সে যেই হোক না কেন মা, বোন, স্ত্রী, মেয়ে নানা বঞ্চনার শিকার অনেককাল আগে থেকেই। সুদীর্ঘকাল ধরে বহু সংগ্রাম করে বর্তমানে মহিলারা নিজেদের জন্যে নানা অধিকার আদায় করেছেন। নানা আইনি অধিকার বলবৎ করেছেন নিজেদের সুরক্ষার জন্য। প্রাচীনকাল থেকে মহিলাদের ঘিরে গড়ে উঠেছিল নানা কুসংস্কার ও কঠোর প্রথা। এবং বিভিন্ন মনীষীর হাত ধরে সেগুলির বিলুপ্তি ঘটেছে। মেয়েরা এখন স্বাধীন ও স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টায়। তা সত্ত্বেও আজও মেয়েরা তাদের পরিবারের মধ্যে পরিজনদের দ্বারা নানা ভাবে বঞ্চনা, নিগ্রহ ও শারীরিক এবং মানসিক যন্ত্রণার শিকার হন। কাজের জায়গায়, রাস্তাঘাটে মেয়েদের সঙ্গে নানা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে চলেছে। তাই তারা যাতে তাদের আশ্রয়স্থল ও পরিবারের মধ্যে নিজের অধিকার নিয়ে সম্মানের সঙ্গে থাকতে পারে তার জন্য পারিবারিক হিংসা প্রতিরোধ আইন ২০০৫ আনা হয়েছে।

আমাদের দেশে মেয়েদের অধিকার রক্ষার্থে ও সুরক্ষার জন্য নানা আইন আছে। তবে এই আইনের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, একটি অভিযোগের উপর ভিত্তি করে একজন মহিলা অনেককিছু প্রতিকার দ্রুত পান।

যে ধরনের অত্যাচারগুলি এই আইনের আওতায় পড়ে সেগুলি হলো—

শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, মৌখিক ও আর্থিক নির্যাতন, যৌন নির্যাতন। কোনও মেয়েকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে দেওয়া, বিয়ের পর গালাগালি করা, ব্যঙ্গ বিদ্রুপ, গঞ্জনা দিয়ে মৌখিক ভাবে মানসিক অত্যাচার। পরিবারের কেউ যদি অশালীন আচরণ করে, কন্যা সন্তান হওয়ায় শারীরিক বা মানসিক ভাবে অত্যাচারিত হতে হয়, সন্তান না হলে তাকে যদি বাড়ি থেকে বিতাড়িত হতে হয়, পণের জন্য জবরদস্তি করা হয় গালাগালি বা মারধোর করা হয়। আমাদের সমাজে অনেক মেয়েকেই তার চেহারা গায়ের রং এসব নিয়েও ব্যঙ্গ বিদ্রূপ সহ্য করতে হয়। এগুলো সবই মানসিক, শারীরিক, মৌখিক ও আবেগ সম্পর্কিত অত্যাচার ধরা হয়।

আবার কোনও মেয়েকে বাড়ি থেকে বিতাড়িত করা বা তাকে কোথাও ভাড়া বা আশ্রয় নিতে না দেওয়া এক কথায় গৃহচ্যুত করা। তাকে বাড়িতে থাকা সত্ত্বেও জীবন ধারণের প্রাথমিক ও প্রয়োজনীয় সব জিনিস থেকে বঞ্চিত করা, যেমন তাকে খাবার জল, পোশাক ও ওষুধপত্র না দেওয়া, তার ভরণপোষণের দায়িত্ব না নেওয়া। তাকে চাকরি করতে না দেওয়া বা তার উপার্জনের সব কিছু ছিনিয়ে নেওয়া যা তাকে আর্থিক ভাবে অসহায়, দুর্বল করে দেয় এমন সব কিছুই আর্থিক নির্যাতন হিসাবে ধরা হবে। যদি কোনও সম্পত্তি স্থাবর বা অস্থাবর, কোনও স্ত্রীধন বা বন্ড শেয়ার সিকিউরিটিজ যাতে তার আইনত অধিকার আছে সেসব থেকে বঞ্চিত করে

তাকে আর্থিক অত্যাচার করা হয়—তাহলে সব এই আইনের আওতায় পড়বে।

যদি কোনও মহিলাকে তার সন্তান-সহ অত্যাচার করা হয় বা মহিলাটির সন্তানকে কষ্ট দেওয়া হয়, তাকে স্কুলে যেতে না দেওয়া হয়। সন্তান সমেত মহিলাকে জোর পূর্বক ঘরে বন্দি করে রাখা, তাদের ভরণপোষণ না করা, যৌন নির্যাতন করা, প্রাণ নাশের হুমকি বা তাদের ক্ষতি করার হুমকি দেওয়া এ সবই পারিবারিক হিংসা প্রতিরোধ আইনের আওতায় আসবে।

সমগ্র ভারতবর্ষ এই আইনের আওতায় (শুধুমাত্র জম্মু ও কাশ্মীর বাদে) আসে। এই আইনে কোনও মহিলার বিরুদ্ধে অভিযোগ নেওয়া হয় না বা কোনও পুরুষ এই আইনে অভিযোগকারী হতে পারবে না। এই আইনের পরিধি অনেক বড়। বিবাহিতা, মা, অবিবাহিত বোন, বিধবা সকলেই এই আইনে নিরাপত্তা পাবেন।

কোথায় এবং কার কাছে অভিযোগ দাখিল করতে হবে :

প্রথম শ্রেণীর জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অভিযোগ জানাতে হবে।

নিম্নোক্ত স্থানগুলিতে অভিযোগ জানানো যাবে—

(১) যে এলাকায় নির্যাতিতা মহিলা স্থায়ীভাবে বসবাস করেন বা বর্তমানে সাময়িক ভাবে বসবাস করেন। বা যেখানে জীবিকা নির্বাহ করেন সেখানকার আদালতে অভিযোগ জানাবেন।

(২) যেখানে অভিযুক্ত বা নির্যাতনকারী বসবাস করেন বা যেখানে অভিযুক্ত বা নির্যাতনকারী চাকরি করে।

(৩) যেখানে ঘটনাটি বা ঘটনাগুলি ঘটেছে সেখানকার আদালতে অভিযোগ দাখিল করতে হবে।

(লেখিকা পেশায় আইনজীবী)

বর্ষাকালে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা

ডাঃ সুশোভন পাল

বর্ষাকালে বায়ুর প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। তার ফলে বেশি পিত্ত সঞ্চয় হয়ে থাকে। একারণে এসময় অগ্নি সর্বদা দুর্বল থাকে। যার জন্য গুরুপাক খাদ্যদ্রব্য, দিবানিদ্রা, নদীর জল পান,অতিরিক্ত ব্যায়াম ও মৈথুন এ সময় একেবরে নিষেধ করা হয়েছে আয়ুর্বেদশাস্ত্রে।

এসময় জ্বর, সর্দিকাশি, অতিসার বা উদরাময়, বিভিন্ন রকমের চর্মরোগ, মাথাঘোরা,খিদে কম পাওয়া, বাতের ব্যথা বৃদ্ধি, টাইফয়েড, ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, ছত্রাক সংক্রমণ,ডায়েরিয়া, আমাশয় ইত্যাদি রোগ সবই বায়ু ও পিত্তের হেরফেরের জন্যই হয়।

এসময় সাধারণ জ্বরে লক্ষ্মীবিলাস রস(নারদীয়), কফকেতু রস, ত্রিভুবনকীর্তি রস বা মৃত্যুঞ্জয় রস প্রভৃতি ওষুধ প্রয়োগে ভালো ফল পাওয়া যায়। জ্বরে গুরুচি রস বা মধু ওষুধের সঙ্গে অনুপান হিসেবে খাওয়া যেতে পারে। এসময় সৈন্ধব লবণের সঙ্গে হরিতকি খেলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

যদি জ্বরের সঙ্গে সর্দি, কাশি বা দুটোই থাকে সেক্ষেত্রে উপরোক্ত ওষুধের সঙ্গে চিত্রকহরিতকি বা শীতোপলাদি চুর্ণ খাওয়া যেতে পারে। অগ্নিবর্ধন অর্থাৎ হজম ক্ষমতা ঠিকঠাক রাখার জন্য চিত্তকাদি বটি বা অগ্নিতুণ্ডি বটি এবং যাদের অম্লপিত্ত বা টক ঢেকুর ওঠার প্রবণতা আছে তারা রাতে খাওয়ার পর গরম জলে গুলিয়ে অহিপত্তিকর চুর্ণও খেতে পারেন।

উদরাময়ের ক্ষেত্রে প্রধানত জলই দায়ী। তাই সবসময় শুদ্ধ জলই পান করতে হবে। উদরাময় চিকিৎসার থেকে রোগ আটকানোই সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। উদরাময় হলে কপূররস বা কূটজঘনবটি বা হরিতকি চূর্ণ ব্যবহার করা যেতে পারে। তাছাড়া যাদের পেট গুড়গুড় বা ভুটভুটের সমস্যা রয়েছে তাঁদের ভাস্কর লবণচূর্ণ অহশ্যই সেবন করতে হবে।

এ তো হলো রোগের চিকিৎসার কথা। কিন্তু আয়ুর্বেদশাস্ত্রে রোগ প্রতিরোধই হলো সর্বোত্তম। কিছু বিশেষ ঋতুচর্চা মেনে চললে সাধারণ রোগগুলিকে সহজেই আটকানো যায়। তার মধ্যে বহুল চর্চিত হলো বর্ষাকালে জল ফুটিয়ে পান করা। আমাদের মুনিঋষিরা খাদ্যাভ্যাস ও জীবনযাপনের ভিত্তিতে আয়ুর্বেদশাস্ত্রে আরও অনেক বর্ষাকালীন ঋতুচর্যার কথা বলেছেন।

বর্ষাকালে পুরনো চাল বা গম(আটা নয়)-এর সঙ্গে আদা অবশ্যই খেতে হবে। রাতে লঘু ভোজন, অবশ্যই আধপেটা খাওয়া এই সময়ে স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো। তবে বল্লুর, শুষ্কশাক বা ছানার দল কোনও ভাবেই গ্রহণ করা উচিত নয়।

গ্রামাঞ্চলে বাড়ির আশেপাশে প্রচুর ভেষজ উদ্ভিদ রয়েছে, বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ মতো ব্যবহার করলে বিনা খরচে আমরা সুস্থ থাকতে পারি।

(যোগাযোগ—৭০৪৪০৬৯১৩৭)

বন্দে মাতরমের অঙ্গচ্ছেদ এবং দেশমাতৃকার বিভাজন

ড. তুষারকান্তি ঘোষ

বন্দে মাতরম্ একটি ধ্বনি, একটি সংগীত। কিন্তু তাল, লয়, ছন্দের বহু ঊর্ধ্বে এর স্থান। 'বন্দে মাতরম্' জীবনাদর্শের গান। পৃথিবীর সব দেশেই জাতীয় সংগীত আছে। কিন্তু একটি সংগীতের পিছনে এত কঠোর পরিশ্রম, নির্যাতনের চরমে পৌঁছেও জীবনের মূল্যবোধের ধারণা, আদর্শ পূর্তির চিন্তা, মৃত্যুঞ্জয়ী দৃঢ়তা— পৃথিবীর কোনও ধ্বনি বা কোনও সংগীতে পাওয়া যায়নি। "They (the British Police) beat up the unarmed patriots with lathis six feet long. Each lathi blow was answered by patriots with shouts of Vandemataram."

মৃত্যুপাগল যুবকেরা কীসে এই অনুপ্রেরণা পেল? পরাধীন ভারতে বহু গান রচিত হয়েছে, কিন্তু এই প্রেরণা তো কোনও গানই দিতে পারেনি। ভারতের আর কোনও গান পেরেছে রক্তস্নাত বেদীর উপর নিজের প্রভাবশালী ঐতিহ্যকে প্রতিষ্ঠা করতে? 'বন্দে মাতরম্' ভারতীয় আধ্যাত্মিক সাধনা, দেশ ও বিশ্বজনীন চিন্তাধারার পটভূমিকায় ঋষি বঙ্কিমের লেখা এক সংগীত। বঙ্কিমের দেশজননী এ যে মাটি নয়— এ যে 'মা'টি। দেশ যে আর মাটির বস্তু নয়— এ যে জাতির যুগ যুগান্তের সাধনার জমাট বিগ্রহ। এই দেশের সেবায় জীবন ধন্য হয়, জীবের অমৃতলাভ হয়। এই শুদ্ধ ভাবধারায় আবেদন নাই, তর্জন নাই, গর্জন নাই, পরমুখাপেক্ষিতা নাই, পরবিদ্বেষ নাই— যা আছে তা শুধু মাতৃভক্তি, অনাবিল দেশপ্রীতি। যা রইল তা দেশ মাতৃকার জন্য সর্বস্ব ত্যাগের উদাত্ত গদ গদ করুণ আহ্বান— সেই গান যে সাহিত্য, যে সত্য সৃষ্টি করেছে তা অমর।

জাতীয়তার ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র বুঝেছিলেন দেশকে পরাধীনতার বন্ধন হতে মুক্ত করতে হলে চাই দেশ সন্তান। কিন্তু সন্তানের বস্তুটি, সাধ্য বিষয়টি হওয়া চাই সত্য, শিব ও সুন্দর। মিথ্যা বা কথার অহমিকা দিয়ে আর যা কিছু পাওয়া যাক না কেন জীবনবেদীতে বন্দে মাতরম্ ধ্বনি দিয়ে প্রাণদানের সন্তান পাওয়া যায় না। সুদীর্ঘ সাধনায় তিলে তিলে ঘটে আত্মদান। আত্মত্যাগের প্রসাদ সর্ব প্রাপ্তির সর্ব রিক্ততা যে আধ্যাত্মিক ভিত্তিতে সম্ভব, বঙ্কিম তাঁর দেশভক্তির মাতৃমন্ত্রের মধ্যে তারই রূপদান করলেন। দেশকেই বঙ্কিমচন্দ্র শুধু বড় করেননি। দেশের সঙ্গে বঙ্কিম দেশধর্ম দিয়েছেন, দিয়েছেন দেশদর্শন। রাজনীতিক বুঝতে পারেন— দেশকে স্বাধীন না করতে পারলে দেশবাসীর কল্যাণ নাই, দেশপ্রেমিক প্রিয় স্বদেশের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত কিন্তু ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা ঋষি যে তার চেয়ে বড়। দেশপ্রাণ সত্যানন্দ বলতে পারেন দেশের মুক্তির জন্য জীবন সর্বস্ব বলি দিব কিন্তু দেশভক্তির স্রষ্টা সে যে বলে— ''জীবন দিলে হইবে না— আরও চাই ভক্তি!''

এই ভক্তির প্রাবল্যে বন্দে মাতরম্ ভারতবর্ষে দেশপ্রেমের বিপ্লব এনেছিল। ''বাংলা কেন ভারতবর্ষের সীমানা অতিক্রম করে 'বন্দে মাতরম্'-এর প্রভাব সমগ্র বিশ্বে স্বাধীনতা আন্দোলনকারীদের সঞ্জীবন মন্ত্র হয়ে উঠেছিল'' (বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা)। ''At the National level the motherland is the mother and the people are her children. The kinships between them is the essence of Nationalism. Vandemataram is an expression of nationalism. আর অরবিন্দের ভাষায় ''Nationalism is a religion that has come from God.''

বন্দেমাতরম্-এর স্রষ্টা বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

এই 'বন্দে মাতরম্' সংগীতে নিজের সুর সংযোজন করে গাইলেন রবীন্দ্রনাথ জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে ১৮৯৬ সালে। ১৯০৫ সালে কাশীতে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে সরলা দেবী মহামতি গোখলের অনুরোধে এই গান করলেন— সপ্ত কোটির পরিবর্তে ত্রিংশ কোটি জুড়ে দিয়ে। সারা ভারতে এই গান সেদিন ভাবের উন্মাদনায় সকল অন্তরকে স্পর্শ করতে শুরু করেছিল। ১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে গর্জে উঠলো বন্দে মাতরম্। এবার সংগীত নয়। নিপীড়িত জাতির নবজাগরণের মন্ত্র। যত বন্দে মাতরম্ ধ্বনি তত প্রতিবাদ। বন্দে মাতরমের অভিব্যক্তি যেন জীবনবোধের সাফল্যের মন্ত্র। উদ্বেলিত হৃদয়ের আওয়াজ। এই মন্ত্র এনে দিবে স্বাধীনতা, এনে দিবে আত্মপ্রত্যয়। বক্তা সুরেন্দ্রনাথ— ''Your innermost feeling should be in perfect harmony with the raga and bhava of vandemataram.'' (A nation in Making)। এই মন্ত্র ছড়িয়ে গেল দিগদিগন্তে। The reviving mantra which is creating a new India, the mantra is Vandemataram. (The Roll of Honour)। বন্দে মাতরম্ সেদিন মিছিলে, বন্দে মাতরম্ সেদিন গানে, বন্দে মাতরম্ সেদিন ফাঁসির মঞ্চে --- আদালতে, আত্মপ্রত্যয়ে, স্বদেশ প্রেমে। সেদিনের স্মৃতিচারণ করে ড. আর. আর. দিবাকর মন্তব্য করলেন, ''The immortal song

Vandemataram became in Swadeshi days the symbol of Nationalism. It spread through out India and was in the lips of all as the national song."

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের হাত ধরেই এল স্বদেশী আন্দোলন। বিদেশি দ্রব্য বর্জন কর। ইংরেজকে আঘাত দিতে হবে বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে। স্বদেশী আন্দোলন এ যে দেশাত্মবোধের চরম নিদর্শন। সেই আন্দোলনেও প্রাণের ভাষা জোগাল বন্দে মাতরম্। ''Swadeshi : was a practical application of love of country. It was an economic political and spiritual weapon. Swadeshi was Vandemataram in action (A Nation in Making)।

বন্দে মাতরম্ সমগ্র দেশে নব জীবনের জোয়ার নিয়ে এল। সমগ্র সমাজ যেন ভয়বিহীন বক্ষের আত্মত্যাগী জনমানসে পরিণত হলো। বন্দে মাতরম্ হলো— সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, শিকলছেঁড়ার স্বপ্নের উদ্দীপনার উৎস, আত্মত্যাগের কঠিন ব্রতের দীক্ষামন্ত্র। এই মহিমময় সংগীত উচ্চারণে জাগে শরীরে এক রোমাঞ্চকর অনুভূতি— শক্তি দেয় সাহস দেয়, তেজোদীপ্ত করে তোলে এই সংগীত। এই মন্ত্রে জীবনবেদীর উপর দাঁড়িয়ে হাসিমুখে প্রাণ দিতে পারে এই দামাল ছেলেগুলো। তাই সুশীল সেনকে বেত মেরে আদালতের ভিতর বন্দে মাতরম্ বন্ধ হয়নি। প্রতিটি বেত্রাঘাতের প্রত্যুত্তরে নির্গত হয়েছিল বন্দে মাতরম্ ধ্বনি— ''Each stroke of the whip was resounded with a cry of Vandemataram" (The Statesman–centenary Number)। এই সেই মন্ত্র যে মন্ত্র জীবনের শেষ সময়ে উচ্চারণ করে মৃত্যুবরণ করলে সার্থক বিপ্লবী হওয়া যায়। স্বদেশভক্তদের কামনা কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের ভাষায় পরিব্যক্ত হলো—

''আমি ধন্য হব মায়ের জন্য লাঞ্ছনা কি সহিলে
ওদের বেত্রাঘাতে কারাগারে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিলে
আমার যায় যেন জীবন চলে
শুধু তোমার কাজে জগৎ মাঝে বন্দে মাতরম্ বলে।''

সহস্র সহস্র বিপ্লবীদের মতো বালক চিত্তরঞ্জন বরিশালে পুলিশের লাঠি খেয়েও বন্দে মাতরম্ বলা ছাড়েনি। নাগপুরে নির্ভীক কেশব হেডগেওয়ার বন্দে মাতরম্ বলা ছাড়েনি নীলসিটি স্কুল থেকে বহিষ্কার হয়েও। তাই কার্লাইল সার্কুলার, লায়নস সার্কুলার, ইংরেজ পুলিশের অত্যাচার, রেগুলেশন, লাঠি, স্কুল হতে রাস্টিকেট দমিয়ে রাখতে পারেনি এই মৃত্যুঞ্জয়ীদের। তাই বুড়িবালামের তীরে সংঘর্ষে শেষ ধ্বনি ছিল বাঘাযতীনদের কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম্'। ইংল্যান্ডের মাটিতে মদনলাল ধিংরার শেষ আওয়াজ ছিল 'বন্দে মাতরম্'।

শেষে বন্দে মাতরমের এমনই প্রভাব এল সাড়া দেশে যে— ''Vandemataram gained prominence in the session. It became a regular habit to sing Vandemataram and shout slogan with every programme. Speakers closed their speeches with the shouting of Vademataram. Vandemataram was sung by girls choir, the audience standing and the congress adjourned after the subjects committee had been elected." (How India wrought her Freedom. Annie Besant).

এই প্রভাবের ফলেই রবীন্দ্রনাথও বক্তৃতা শেষ করতেন বন্দে মাতরম্ ধ্বনি দিয়ে। ''অদ্য কঠিন ব্রত নিষ্ঠ বঙ্গভূমির প্রতিনিধি স্বরূপ সেই কয়েকজন এই দুঃসহ অগ্নি পরীক্ষার জন্য বিধাতা কর্তৃক বিশেষ ভাবে নির্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহাদের জীবন সার্থক। রাজরোষ, রক্ত, অগ্নিশিখা, তাঁহাদের জীবনের ইতিহাসে লেশমাত্র কালিমা পাত না করিয়া বার বার সুবর্ণে অক্ষরে লিখিয়া দিয়াছে— বন্দে মাতরম্।''

(—ভাণ্ডার, ১৩৩২, ফাল্গুন স্বদেশীদের উপর পুলিশের অত্যাচার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য)।

ক্রমে 'বন্দে মাতরম্' শব্দ দেওয়াল, দরজায় লিখিত হতে লাগল। পতাকায় উৎকীর্ণ হলো 'বন্দে মাতরম্'। এমন কি 'নেমপ্লেটের' উপর বন্দে মাতরম্ শোভিত হতে লাগল। বাণিজ্যদ্রব্যের উপর মোড়কে বন্দে মাতরম্ মুদ্রিত হলো। বিভিন্ন অধিবেশনে উপস্থিত প্রতিনিধিদের শাড়ি কিংবা ধুতিতে 'বন্দে মাতরম্' সুদৃশ্য করে ছাপানো হলো। দেশ ও বিদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জীবনবোধের ও আত্মত্যাগের প্রতীক মন্ত্র হয়ে উঠল 'বন্দে মাতরম্'।

।। দুই।।

১৯৩২-এ কংগ্রেসের অধিবেশন বসল বর্তমান অন্ধ্রপ্রদেশের কাঁকিনাড়াতে। মৌলানা মহম্মদ আলি ছিলেন কংগ্রেস সভাপতি। বিষ্ণু দিগম্বর পালুসকর 'বন্দে মাতরম্' গাইতে মঞ্চে উঠলেন। ''Moulana Sahed raised an objection on the ground that music was taboo to his religion. The leaders were completely bewildered. Vishnu Digambar was incensed and hit back. This is the National forum, not the beat of any single community. This is no mosque to object music. There is no justification for a ban on music here (Vishnu Digambar Paluskar– National Book Trust)। মৌলানার কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করে বিষ্ণু দিগম্বরের উদাত্ত কণ্ঠের 'বন্দে মাতরম্' সংগীত অধিবেশন মণ্ডপকে প্রাণবন্ত করে তুলল।

বন্দে মাতরম্ ধ্বনি তো মুসলমানরা দিয়েছিল স্বদেশি যুগে। ১৯০৫-এ ৭ আগস্ট বঙ্গভঙ্গ বিরোধী যে শোভাযাত্রা কলকাতায় টাউন হলের দিকে দৃপ্তভঙ্গীতে এগিয়ে চলেছিল সেই শোভাযাত্রায় ক্যালকাটা মাদ্রাসার ছাত্র সমাজের বুকে আটকানো ছিল বন্দে মাতরম্ 'ব্যাজ', কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল 'বন্দে মাতরম্'। কেউ আপত্তি করেনি। মতিলাল রায় স্বদেশি যুগের স্মৃতিতে লিখেছেন— ''কাতারে কাতারে রাজপথের উপর দিয়া স্কুল কলেজের ছাত্র সেদিন গভীর নিনাদে 'বন্দে মাতরম্' শব্দে জগতের হৃৎকম্প উপস্থিত করিয়াছিল।'' এই ''11th of August was the birthday of Indian Nationalism, and Indian Nationalism

means two things, the self concentration to the gospel of national freedom and practice of Independence." —এই দুটোর জন্যই তো ভারতবাসীর লড়াই ছিল— পরাধীনদেশের অধিবাসীরা তো হিন্দু মুসলমান উভয়েই ছিল। কিন্তু বাধা এল মুসলমান মনের প্যান-ইসলামিক ধারণা থেকে। ধর্ম তাদের সমস্ত রাজনৈতিক কার্যকলাপকে প্যান-ইসলাম মুখী করে রেখেছিল। তাই বন্দে মাতরমে এক শ্রেণীর বিভাজনপন্থী মুসলমানদের আপত্তি ছিল, তারই প্রকাশ দেখা গেল— " 'বন্দে মাতরম্' আগাগোড়া পৌত্তলিকতা কণ্টকিত বন্দনাগীতি ও স্তোত্র। তৌহীদ দারস্ত মুসলমান 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও 'বন্দনা' করতে পারে না— করলে তার সত্যিকার মুসলমান বিশ্বাসের মূলেই কুঠারাঘাত হয়। ইসলামের প্রধানতম মৌলিক শিক্ষাই হচ্ছে 'তৌহীদ'--- একেশ্বরবাদ। মুসলমান মাতৃ ভূমিকে ভালবাসে নিশ্চয়ই কিন্তু স্বদেশ প্রীতির ক্ষণস্থায়ী হুঙ্কারের জন্য তারা ইসলামের শ্রেষ্ঠতম শিক্ষা ও সৌন্দর্য বিসর্জন দিতে পারে না। মুসলমানের পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনের সহিত ধর্মের বন্ধন অচ্ছেদ্য। ইসলামের ইহা অনবদ্য শিক্ষা ও বৈশিষ্ট্য।"---(আনন্দমঠের আদর্শ--- আল-ফারুক)।

হিন্দু ধর্মের মূল কথা তো 'একম্ সৎ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি'— একথা হাজারবার বললেও মুসলমানরা এই সত্য অনুধাবন করতে পারবেন না। কারণ সেই প্যান-ইসলামিয় দৃষ্টিকোণ তাদের চিন্তার মধ্যে। সকল মুসলমান এই দৃষ্টিতেই কি 'বন্দে মাতরম্'কে দেখেছেন? তা নয়। জাতীয়তাবাদী মুসলমান মনীষী রেজাউল করিমের বক্তব্য এখানে প্রণিধানযোগ্য।

''নানাবিধ ফতোয়ার দ্বারা বিব্রত মুসলমান সমাজের জন্য আর একটা অভিনব ফতোয়া জারি হইয়া গেল— সমগ্র মুসলমান সমাজকে 'বন্দে মাতরম্' সংগীত পরিত্যাগ করিতে হইবে। মুসলমানের ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতি সব কিছুই বিপন্ন হইবে, বিধ্বস্ত ও নির্মূল হইবে, যদি না 'বন্দে মাতরম্' পরিত্যাগ করে। অনুমান সাতশত বৎসর ধরিয়া ভারতে মুসলমান বসবাস করিয়া আসিতেছেন। এই সুদীর্ঘ যুগের মধ্যে মুসলমানের অস্তিত্ব ও নিরাপত্তার পক্ষে সর্বাপেক্ষা মারাত্মক কথা হইতেছে 'বন্দে মাতরম্'। সুতরাং ইহা পরিত্যাগ না করিলে মুসলমান এক দণ্ড টিকিতে পারিবে না। যে ইসলামকে আমরা উদার, সার্বজনীন ও সর্ব কালোপযোগী ধর্ম বলিয়া গর্ব করিয়া থাকি তাহা কিন্তু 'বন্দে মাতরম্' একটি মাত্র অক্ষর দ্বারা বিপর্যস্ত, নির্মূল হইয়া যাইবে। সেইজন্য ইসলামের কল্যাণকামী নেতাগণ পূর্বাহ্নেই মুসলমানকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন 'বন্দে মাতরম্' সংগীত পরিত্যাগ করিতে হইবে। আমাদের তথাকথিত নেতাগণ দেশের দিকে দিকে বন্দে মাতরম্'-এর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন। ইসলাম আজ বিপন্ন, ইসলামের তরী আজ নিমজ্জমান, সমগ্র মুসলমান আজ শুদ্ধিওয়ালাদের মুখের গ্রাস হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং কে আছ সমাজহিতৈষী, ইসলামকে যদি বাঁচাইতে চাও, তবে অবিলম্বে 'বন্দে মাতরম্' পরিত্যাগ করো।

''বন্দে মাতরম্-এর বিরুদ্ধে এই যে ফতোয়া জারি হইল, ইহা কিন্তু ইসলাম ধর্মে অভিজ্ঞ ও কোরআন বিশেষজ্ঞ আলেম-ফাজেলদের ফতোয়া নহে। এই ফতোয়া জারি হইল কতকগুলি রাজনৈতিক ভাগ্যান্বেষী কোট-প্যান্ট পরিহিত সাহেবিয়ানা ঢঙের ব্যারিস্টার ও সেই শ্রেণীর লোকেদের দ্বারা। যাঁহারা জীবনে কোনওদিন মসজিদের প্রাঙ্গণেও চরণধূলি দিবার অবসর পান নাই, ইসলামের সহিত সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে যাঁহাদের কোনও সম্বন্ধই নাই, সেই সব ব্যক্তিগণ আজ 'বন্দে মাতরম্'-এর বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। ইসলাম কীসে নষ্ট হয় আর কীসে রক্ষা হয়, এই বিষয়ে আলোচনা করিবার একচেটিয়া অধিকার মিস্টার জিন্না, অথবা স্যার নাজিমুদ্দিনের নাই। এমনকী যে মৌলানা অকরম খাঁ সাহেব নিজেকে ইসলামের একমাত্র বিশেষজ্ঞ বলিয়া দাবি করিতেছেন তাঁহারও সেই অধিকার নাই। ইসলামকে যাহারা কামধেনু রূপে ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, তাহাদের কোনও মতকেই অকাট্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। খিলাফতের যুগে মৌলানা আকরম খাঁ যখন মুসলমানকে কংগ্রেসে যোগ দিতে বলিয়াছিলেন তখন তিনি কোরআন-হাদীসকে ভিত্তি করিয়া সেই রূপে কথা বলিয়াছিলেন? সে যুগে যখন বন্দে মাতরম্ গীত হইত এবং বন্দে মাতরম্ ধ্বনিতে আকাশবাতাস বিদীর্ণ হইত, ১৯০৬-১৯১১ সালের স্বদেশী যুগেও তিনি বন্দে মাতরম্-এর ভক্ত ছিলেন তখন তিনি সেই কোরআন-হাদীসে তাহার বিরুদ্ধে

বন্দেমাতরম্- ধ্বনিতে যাঁরা হাসিমুখে জীবন দিলেন তাঁদেরই একজন ক্ষুদিরাম বসু।

কোনও প্রমাণ পান নাই।

''বন্দে মাতরম্-এর যে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে তাহা অতি অল্পদিনের। ইহার পূর্বে ভারতের প্রতি সভায় এই গান গীত হইত, আর 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিও সর্বত্র ব্যবহৃত হইত। সুতরাং আমাদের প্রশ্ন— এই গান ইসলাম বিরোধী হইলে খিলাফতের যুগে মৌলানা আজাদ, মৌলানা মহম্মদ আলি, শৌকত আলি, জাফর আলি, হসরত মোহানী প্রমুখ নেতাগণ তখন কেন ইহার বিরুদ্ধে আপত্তি তুলেন নাই? যেসব সভায় এই গান গীত হইত, অথবা 'বন্দে মাতরম্' শব্দ ধ্বনিত হইত, সে সব সভায় তাঁহারা উপস্থিত হইতেন, বক্তৃতা দিতেন এবং বিনা প্রতিবাদে উক্ত সংগীতের সম্মানে দণ্ডায়মান হইতেন। তারপর বহুযুগ পর্যন্ত এই গান দেশের বিভিন্ন সভায় গীত হইয়া আসিতেছে। কেহই তো ইহার কোনও প্রতিবাদ করেন নাই। জিন্না সাহেব যখন আইন সভার আসন ও চাকরির সমস্যা লইয়া দেশময় আন্দোলন করিতেছিলেন এবং বহু কংগ্রেসি মুসলমানকেও তাহাদের দলে ভিড়াইতে লাগিলেন তখনও 'বন্দে মাতরম্' সম্বন্ধে কেহই কোনও আপত্তি করেন নাই, আপত্তি করা তো দূরের কথা কেহই কোনও কথা পর্যন্ত তোলেন নাই। তারপর দেশের বুকের উপর দিয়া কত ঝড় বাতাস বহিয়া গেল, কত লোকের মাথায় পুলিশের লাঠি ভাঙিয়া গেল, কারাগারে বন্দিশালায় কত দেশ প্রেমিকের জীবনপ্রদীপ নির্বাপিত হইয়া গেল। আর দেশবাসী এই 'বন্দে মাতরম্' সংগীতের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া দৃপ্ত আননে সকল অত্যাচার ও অনাচার সহ্য করিয়া গেল। জাতির এই মহা পরীক্ষার সময় কোনও নেতাই 'বন্দে মাতরম্' মধ্যে ইসলাম বিরোধী ভাবধারা লক্ষ্য করেন নাই। ১৯৩৭ সালে হঠাৎ কী এমন ঘটনা ঘটিল যাহার জন্য 'বন্দে মাতরম্' ইসলাম বিরোধী হইয়া উঠিল— বন্দে মাতরম্-এর নামে ইসলামের কৃষ্টিকলা সব নষ্ট হইতে বসিল?

''আমাদের তথাকথিত নেতারা সাম্রাজ্যবাদের গুপ্তচর স্বরূপ আজ কয়েক বৎসর হইতে মুসলমানের মধ্যে কংগ্রেস বিরোধী ভাবধারা প্রচার করিবার জন্য যে ব্রত পালন করিয়া আসিতেছেন 'বন্দে মাতরম্'-এর বিরুদ্ধে আন্দোলনটা সেই ব্রতেরই অন্যরূপ মাত্র। যদি সাধারণ মুসলমান কংগ্রেসের সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী হইয়া কংগ্রেস-পন্থী হইয়া পড়ে তাহা হইলে লিগের মৃত্যু অনিবার্য। এই সঙ্গীন অবস্থা হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় আবিষ্কৃত হলো বন্দে মাতরমের বিরুদ্ধে আন্দোলন সৃষ্টি করা। মুসলমান সমাজ লিগ পন্থীদের প্ররোচনায় পড়িয়া, রাজনৈতিক সমস্যা, অর্থনৈতিক সমস্যা সবই ভুলিয়া গেল— মনে রহিল কেবল বন্দে মাতরম্ সমস্যা। কংগ্রেস বন্দে মাতরম্ বিসর্জন দিলেই ইসলাম উদ্ধার হইয়া যাইবে।

''...'বন্দে মাতরম্'-এ দেশমাতৃকাকে হিন্দু দেবদেবীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে। ইহা ইসলামের দৃষ্টিতে আদৌ নিন্দনীয় নহে। আরবের পারস্যের কবিগণ এই উপমামূলক বহু কবিতা রচনা করিয়াছেন। 'বন্দে মাতরম্'-এ হিন্দু দেবদেবীর নিকট মুসলমানের মাথা নোয়াইবার কোনও প্রশ্ন উঠে না। কোনো মুসলমান পরিপূর্ণ ঈমান লইয়া আল্লাহতালার প্রগাঢ় বিশ্বাস রাখিয়া 'বন্দে মাতরম' সংগীত গাহিতে পারে, এরূপ করিলে তাহার ঈমানের একটুও ব্যাঘাত উৎপাদন হইবে না।...ইহার (বন্দে মাতরম্ সংগীত) অন্তর্নিহিত মাধুর্যের কারণে ইহা জাতীয় সংগীতে পরিণত হইতে চলিয়াছে। আনন্দমঠ ইহার মর্যাদা বৃদ্ধি করে নাই। ইহার মর্যাদা অপূর্ব শব্দ সম্ভার ও ভাবসম্পদে।

''...বন্দে মাতরম ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক শ্রোতার মনে ভারতবাসীর পঞ্চাশ বৎসরের জাতীয় সংগ্রামের স্মৃতি জাগিয়া উঠে। 'বন্দে মাতরম্'! লক্ষ লক্ষ জনতার সম্মুখে যখন স্বেচ্ছাসেবকগণ আকুল ভাবে ডাকিয়া উঠে 'বন্দে মাতরম্', তখন সমগ্র জনতা অধীর উৎসাহে পুলকিত হইয়া উঠে। কোন সুদূর অতীতে কতশত জন জাতীয় পতাকা স্বহস্তে বহন করিয়া এই 'বন্দে মাতরম্'-এর জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়াছে। তাহারই স্মৃতি তখন জনতার মন উৎক্ষিপ্ত করিয়া তোলে,—সে তখন সেই ডাকে আত্মবলিদানের কথাই ভাবিয়া থাকে। ভারতবাসী কোনোদিনই জাতীয়তার বীজমন্ত্র এই 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি পরিত্যাগ করিতে পারিবে না।... স্বদেশী যুগ, অসহযোগ ও আইন- অমান্য যুগ আজ আমাদের নিকট অতীত ইতিহাসের বস্তু; এই সব পুণ্যময় স্মৃতিকে জাগাইয়া রাখিয়াছে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, বিস্মৃতির কবল হইতে হৃদয় মধ্যে গাঁথিয়া রাখিয়াছে একটি মাত্র ধ্বনি— 'বন্দে মাতরম্'। এই ধ্বনি ভারতবাসী কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। এই ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে লিগ পন্থীগণ লজ্জায় মরিয়া যাইবেন, কারণ এই দীর্ঘ ৫০ বৎসরের স্বাধীনতার ইতিহাসে তাঁহাদের দিবার মতো কিছুই নাই। পরাজয় ও অকর্মণ্যতার গ্লানি মুছিবার জন্য আজ তাহারা 'বন্দে মাতরম্'-এর বিরুদ্ধে লাগিয়াছেন।...

''আমাদের পঞ্চাশ বৎসরের জাতীয় সংগ্রামের সহিত 'বন্দে মাতরম্' সংগীত ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। জাতি কিছুতেই বন্দে মাতরম্ সংগীত পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। 'বন্দে মাতরম্'-এর স্থানে অন্য কোনও সংগীতকে জাতীয় সংগীত রূপে গ্রহণ করিতে পারে না। সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে এই 'বন্দে মাতরম্' সংগীত জাতির মাথা উঁচু করিয়া তুলিয়া রাখিয়াছে। মুর্মুষু জাতি এই সংগীত গাহিয়া নবকলবরে জাগিয়া উঠিয়াছে। হতাশায় নিরাশায় জাতির শক্তি যখন দ্বি-খণ্ডিত হইতে বসিয়াছিল, তখন জাতি এই সংগীতকে সম্বল করিয়া আবার এক হইয়াছে।... এতদিনের মহাসাধনার পর জাতি যখন সিদ্ধির পথে পাড়ি দিয়াছে তখন সে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি ও সংগীত কিছুতেই পরিত্যাগ করিবে না। দৃঢ় উদ্ভব এই সংগীতকেই ধরিয়া রাখিবে। বিপদের কালরাত্রি সম্মুখে--- সাম্প্রদায়িকগণ, সাম্রাজ্যবাদের গোয়েন্দাগণ— নূতন মূর্তিতে, নূতন ছলনা লইয়া দেশের মহাব্রতকে নষ্ট করিতে আসিতেছে— অচিরেই তাহাদের সকল উদ্যম ব্যর্থ হইবে। বলো দেশবাসী, উচ্চকণ্ঠে বলো— 'বন্দে মাতরম্'! সেই বরিশালে ও সিরাজগঞ্জে, যেরূপ উদাত্ত কণ্ঠে বলিয়াছিলে— তেমনি জোরে মিলিত কণ্ঠে বলো— 'বন্দে মাতরম্'!" (—বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ, ১৯৪৪ পৃ. ৯০-১০২)

এই বলিষ্ঠ ভাষা জাতীয় নেতাদের কর্ণকুহরে পৌঁছায়নি। সাম্প্রদায়িক তোষণের অন্ধ আবেগে জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা তখন মোহমুগ্ধ। মুসলিম লিগ পন্থীদের সন্তুষ্ট করতে তখন তারা মাতৃসংগীত'কে খণ্ডিত করার জন্য অস্ত্রধারণ করেছে। সেই অস্ত্র হানল ১৯৩৭-এ।

।। তিন।।

'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি ও সংগীতকে নিয়ে বিতর্কের জোয়ার এল। বাইরে থেকে লিগপন্থীরা এই বিতর্কে ঘৃতাহুতি দিল। আর কংগ্রেসের অভ্যন্তরে মুসলমান সদস্যরা বন্দে মাতরমের তীব্র বিরোধিতা শুরু করল। আর কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ এই বিতর্ক সমাধানের অতি সহজে পথ বেছে নিলেন এদেরই তোষণ করে। বন্দে মাতরমের উপর আঘাত হানার প্রচেষ্টা শুরু হলো। ইকবালের 'হিন্দুস্তা হমারা'কে চালু করার চেষ্টা শুরু হলো।" In 1922 the Congrss introduced Iqbal's 'Hundusthan Hamara' as supplementary National Song. It was simply to please the Urdu knowing public. 'Hindusthan Hamara' was found to be state and flat before Vandemataram, and it could not take the place of a national anthem." (Fifty years of Congress Rule–Guru Datta)।

কংগ্রেসের মধ্যে 'বন্দে মাতরম্' বিতর্ক যখন চরমে তখন তারা একটি সাব-কমিটি গঠন করল কোন সংগীত জাতীয় সংগীত রূপে স্বীকৃত হবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য। এই কমিটিতে ছিলেন জওহরলাল নেহরু, সুভাষচন্দ্র বসু, আবুল কালাম আজাদ ও আচার্য নরেন্দ্র দেব। এঁদের সুপারিশে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি 'বন্দে মাতরম্' সংগীত বিভাজনের সিদ্ধান্ত নিল। প্রস্তাবে লিখিত হলো (২৮.১০.১৯৩৭)-"বিগত ত্রিশ বৎসর দেশের সর্বত্র অসংখ্য স্বদেশপ্রেমিক বন্দে মাতরম্ উচ্চারণ করিতে করিতে অনায়াসে মৃত্যুবরণ করিয়াছেন এমন বহু নরনারীর দৃষ্টান্ত আছে। এই রূপে এই সংগীতও 'বন্দে মাতরম্' শব্দদ্বয় বিশেষ ভাবে বাংলাদেশে এবং সাধারণ ভাবে ভারতবর্ষের সর্বত্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধাচারণের প্রতীক স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র শক্তির উৎস হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আমাদের দেশবাসী এই মন্ত্রে অপূর্ব প্রেরণা লাভ করিয়াছেন, ইহা একটা বন্দনাগীতি। এই গীতি আমাদিগকে জাতির মুক্তি সংগ্রামের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।"

"বন্দে মাতরমের সংগীতের দুইটি কলি ক্রমে অন্যান্য প্রদেশেও বিস্মৃত হয় এবং জাতীয়ভাবের জ্যোতিষ্ক বলিয়া বিবেচিত হয়। গানের অবশিষ্টাংশ কদাচিৎ গীত হইত, আজও খুব কম লোকেই উহা জানে। প্রথম দুটি কলিতে সুললিত ভাষায় জন্মভূমির সৌন্দর্য ও তাহার দান বর্ণনা করা হইয়াছে। এই দুইটি কলিতে আপত্তির এমন কিছুই নাই, যাহা ধর্মের দিক হইতে বা অন্য কোনও হিসাবে আপত্তিকর বিবেচিত হইতে পারে। ভারতবর্ষের কোনও শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধাচারণের উদ্দেশ্যে এই সংগীত কদাপি গান করা হয় না।... এই কলিতে কাহারও আপত্তি করিবার কিছুই নাই। সংগীতের অবশিষ্টাংশ অনেকেই জানে না এবং প্রায় গান করা হয় না। উহাতে এমন বিষয়ের উল্লেখ আছে এবং ধর্ম বিষয়ক এমন ভাব বর্ণিত হইয়াছে যাহা ভারতবর্ষের অন্যান্য সম্প্রদায়ের আদর্শের সহিত সামঞ্জস্যবিহীন। 'বন্দে মাতরম্' সংগীতের কোনও কোনও অংশ সম্পর্কে মুসলমান বন্ধুগণ যে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন ওয়ার্কিং কমিটি তাহার যৌক্তিকতা স্বীকার করিতেছেন।"

বন্দে মাতরমের বিভাজনের পরে, ১৯৪৭'-এ দেশবিভাজনের পরও তপস্যা চলছে— সে তপস্যা ভাঙেনি। বিভাজনের নায়কদের চ্যালা চামুণ্ডাগুলো আজও তপস্যা চালাচ্ছে, এক সর্বনাশা তপস্যা।

সেইজন্য 'বন্দে মাতরম্'-এর বিভাজন হয়ে গেল। সেদিন কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি ভারতবর্ষের প্রাণের জাতীয় সংগীতকে খণ্ডিত করেছিলেন মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার কাছে নতি স্বীকার করে। ১৯৩৭-এর জাতীয় সংগীত সম্পর্কে সিদ্ধান্ত ১৯৪৭ -এ ভারত ভাগ করার প্রবৃত্তির পূর্ব প্রয়াস মাত্র।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ছিল তদানীন্তন স্বাধীনতা আন্দোলনের নির্ভীক প্রহরী আনন্দবাজার পত্রিকা। এই পত্রিকা পরদিন বলিষ্ঠ ভাষায় ঘোষণা করল—"বন্দে মাতরম্ সংগীতের সমাধি রচনায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্ত (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৯.১০.১৯৩৭)। কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে লেখা হলো— 'বন্দে মাতরম্' সংগীত কার্যকরী সমিতির স্ববিরোধী দ্বিধা দুর্বল বিকৃতির ফলে জাতীয়তাবাদী ও স্বদেশ অনুরাগী নর-নারীমাত্রই স্তম্ভিত হইয়াছেন। প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তাদ্রোহী সাম্প্রদায়িক সুবিধাবাদীদের বিশেষ দুষ্ট অভিসন্ধিপূর্ণ বিকৃত সমালোচনাকে কেন যে মহামান্য নেতৃবৃন্দ এতখানি গুরুত্ব দিতে বাধ্য হইলেন আমরা তা বুঝিতে অক্ষম। সভাপতি জওহরলাল বক্তৃতামুখে কার্যকরী সমিতির সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে গিয়া যে সকল যুক্তি দেখাইয়াছেন এবং যেভাবে উহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার একদেশদর্শিতায় আমরা ক্ষুব্ধ চিত্তে ভাবিতেছি কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ অতিমাত্রায় সমালোচনায় অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছেন। কিছুদিন যাবৎ বহু গুরুতর ব্যাপারে কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশনের অপেক্ষা না রাখিয়া অথবা নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির মতামত না লইয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে কার্যকরী সমিতি

আর ইতস্তত করেন না।"

"...মুক্তিকামী রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের কণ্ঠে এই ধ্বনি ও সংগীত এক ঐতিহাসিক মহাবীর্যকে আশ্রয় করিয়া কেন উদ্দীপ্ত হইল, লক্ষ কোটি বর্ষ হইতে সমুৎসারিত এই সংগীত ভারতের প্রান্তর হইতে প্রান্তরে ধ্বনিত হইয়া দেশাভিমানের দিব্য প্রেরণা জাগ্রত করিল, এত অফুরন্ত প্রাণশক্তির প্রেরণা এই সংগীতের মধ্য দিয়া কেন প্রকাশ পাইল— ভোটদ্বারা কোনওদিনই তাহা নিরুপিত হইবে না, হইতে পারে না। ইহা জাতির প্রাণ ধর্মের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি, ইহা রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের গতি তীব্রমুক্তি প্রস্ফুরিত মহিমা। স্বদেশ যে বর্তমানের লাঞ্ছনা ও দুর্গতির উর্ধ্বে ধ্যাননেত্রে প্রত্যক্ষ করেন নাই, পরাধীনতার বেদনায় যাহার বক্ষ কোনওদিন প্রচণ্ড অভিমানে ফুলিয়া উঠে নাই, সে ইহা বুঝিবে না।... 'বন্দে মাতরম্' এই সার্বভৌমিক আদর্শবাদের জন্যই ইহা সমগ্র ভারতের রণহুঙ্কার জয়ধ্বনি এবং জননী জন্মভূমির প্রতি অনুরাগের নিদর্শন— ইহা যদি সত্যি হয় তাহা হইলে কার্যকরী সমিতির বিবৃতির শেষ অংশে এমন ভীরু দৌর্বল্যে এলাইয়া পড়িলেন কেন? যে সংগীত স্বাভাবিক ভাবেই জাতীয় সংগীত রূপে পরিণত এবং ভারতের সর্ববিধ ধর্ম সম্প্রদায়ের বুক হইতে বেদনাশৈল তুলিয়া লইবার জন্য এত পরামর্শ, এত দুশ্চিন্তা, এমনকী বৃদ্ধ কবিবরের সার্টিফিকেট সংগ্রহ করিবার পরও, তাহাদের পছন্দসই অংশটুকু প্রত্যেক জাতীয় সম্মেলনে এবং কংগ্রেসে আবশ্যিক জাতীয় সংগীত রূপে গ্রহণ করিবার পরামর্শ দিলেন না কেন— কিংবা দিতে কুণ্ঠিত হইলেন কেন?"

"...বাংলার নব্য জাতীয়তাবাদীদের অগ্রগামী চিন্তাধারাও দূর ভাবীকালের দিকে প্রসারিত; কোনও অতীতকে আঁকড়িয়া ধরিয়া গণ্ডী রচনায় তাহারা বিরোধী। সুতরাং কংগ্রেসের মডারেটিয় দৃষ্টিভঙ্গি ও উনিশ শতাব্দীর জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনৈতিক অহিংসাবাদের মিলিত মিশ্রিত আদর্শ অনুপ্রাণিত, কার্যকরী সমিতির সেই প্রাচীনপন্থী প্রবীণ নেতা— যাহাদের অগ্রগামী চিন্তা ও কর্মধারাকে কংগ্রেসে প্রবেশ করিতে দিতে একান্ত অনিচ্ছুক, তাহারা বন্দে মাতরম্-এ ভীত হইলেন, না সাম্প্রদায়িকতাবাদী, জাতীয়দ্রোহী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভিক্ষোপজীবী শ্রেণীর মুসলমান রাজনৈতিক গুণের প্রতি তাঁহাদের চরিত্রগত স্বাভাবিক ভীতির জন্য বেসামাল হইলেন--- এ রহস্যের বাংলার নব্য জাতীয়তাবাদীরা কিনারা পাইতেছে না। জওহরলাল জানিতে না পারেন, কিন্তু সুভাষচন্দ্র জানেন, বাঙালি বঙ্কিমের পর বিবেকানন্দের নিকট স্বদেশ প্রেমে দীক্ষা লইয়াছিল এবং সেই সিংহ সন্ন্যাসীর নিকট শুনিয়াছিল—"আগামী পঞ্চাশ বৎসরকাল জননী-জন্মভূমিই তোমাদের উপাস্য দেবতা হউক, অন্যান্য অকেজো দেবতাদের কিছুদিনের জন্য ভুলিলে ক্ষতি নাই।" কাজেই রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে জাতীয় সংগীতের ব-কলমে বাংলার জাতীয়তাবাদীরা দেব-দেবীর বন্দনা চালাইতে চাহে, এই রূপ অপবাদ ও বক্রোক্তির বিরুদ্ধে বাঙালি মাত্রেই প্রতিবাদ জানাইবে। এই প্রতিবাদ কত অকৃত্রিম, কত তীব্র তাহা নেতারা ক্রমে বুঝিবেন। এখনও সময় আছে, নি: ভা: রাষ্ট্রীয় সমিতি নেতাদের সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়া 'বন্দে মাতরম্'কে কংগ্রেস অনুমোদিত একমাত্র জাতীয় আদর্শবাদের মর্যাদা রক্ষা করুন, সমগ্র দেশ ও জাতি তাঁহাদের জয়ধ্বনি দিয়া বলিবে 'বন্দে মাতরম্'।

আনন্দবাজার পত্রিকা এমন বলিষ্ঠ প্রতিবাদ তদানীন্তন কালে সচরাচর আর কোথাও দেখা যায়নি। সেদিনের বঙ্কিমের ঋষিসুলভ দৃষ্টিকোণ যাঁরা অন্ধদৃষ্টিতে দেখেছিলেন, তারাই পরবর্তীতে দেশভক্তির সঙ্গে আপোশ করেছিলেন ক্ষমতার লোভে ১৯৪৭ সালে। যাঁরা বঙ্কিমের সঞ্জীবনী সংগীতের অর্থবোধগম্য করার মানসিকতা হারিয়ে ছিলেন তাঁরাই বাদ দিয়েছিলেন গানের শেষ স্তবকগুলো। এবং দশ বছর পর এই শাসককুলই সাম্প্রদায়িকতার নির্মম খড়্গে খণ্ডিত করেছিলেন দেশ জননীকে।

।। চার।।

মুসলিম লিগ ১৯৪১ এর ২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবস পালন করল। কারণ ওই দিনটিতেই ১৯৪০-এ লাহোর অধিবেশনে পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল— সেই স্মরণে। গ্রামে গ্রামে মুসলিম লিগের সদস্যেরা মৌলানা আলির বক্তব্য উদ্ধৃত করে বললেন— "When Islam calls I am a Moslem first, Moslem secend and Moslem third, nothing but a Moslem." লিগের এই গণসংযোগ দেশে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাকে volcanic fire-এ পরিণত করল।

১৯৪৬-এর নির্বাচনে লিগ শক্তিশালী হওয়ায় তারা ঘোষণা করল— "The General Election is the begining of our struggle. We shall direct our attention towards British imperialism and demand immediate transference of power to the people of India on the basis of Pakistan." মুসলিম লিগ দেশভাগের দাবি করল। মুসলিম লিগের বক্তব্য হলো ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট যদি অখণ্ড হিন্দুস্থান স্থাপন করেন অথবা একটি গণপরিষদের ব্যবস্থা করেন তাহলে মুসলমানেরা তাদের তরবারি কোষমুক্ত করবেন। ফিরোজ খাঁ নুন বললেন, "যদি ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠা করে তবে মুসলমানগণ যা করবে তাতে চেঙ্গিজ খাঁর কীর্তি ম্লান হয়ে যাবে। (The destruction and havoc that the Muslim will do in this contry will put into the shade what Jhengis Knan did.) আর জিন্না ক্রিপস মিশন ও ক্যাবিনেট মিশনের গতি প্রকৃতিতে পাকিস্তানের গঠন সম্ভাবনা ক্ষীণ দেখে সারা ভারতবর্ষে পাকিস্তানের দাবিতে 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন' ঘোষণা করলেন। সারাদেশে হিংসাশ্রয়ী দাঙ্গায় ভারতবর্ষ যেন বধ্যভূমিতে পরিণত হলো।

এই পরিবেশে ১৯৪৭-এর ২২ মার্চ মাউন্টব্যাটেন ভারতে ভাইসরয় হয়ে এলেন। আসার আগে ব্রিটেনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে কথা দিয়ে এসেছিলেন, "মুসলমানেরা আমার একান্ত সঙ্গী। আমি তাদের কোনো ক্ষতি হতে দেব না।" ব্রিটিশদের ঘোষণা অনুযায়ী মাউন্ট ব্যাটেন ভারতকে স্বাধীনতা প্রদান করার জন্য হাতে এক বছর তিন মাস

আট দিন সময় পেয়েছিলেন। ব্রিটিশ সরকার ১৯৪৮-এর জুন মাসে ভারতকে স্বাধীন করার অঙ্গীকার করেছিল।

লিগ যখন পাকিস্তানের দাবি আদায়ের জন্য রক্তের পথ বেছে নিল, তখন তাদের উন্মত্ততা দেখে ভারতবাসী পাকিস্তান গঠনের প্রসঙ্গে গান্ধীজী, জওহরলালের মনোভাব জানার জন্য উদগ্রীব ছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীজী ৩১.৩.১৯৪৭ সালে ঘোষণা করলেন— ''If congress wishes to accept partition, it would be over my dead body.'' জওহরলাল দিল্লিতে ঘোষণা করলেন, ''The Congress is not yielding to the League demand for Pakistan under any circumstances.'' (The Foot prints on the Road to indian Independence– K.C. Ghosh)। আগ বাড়িয়ে জওহরলাল নেহরু আরও একটা ঘোষণা করলেন, ''The idea of the formation of Pakistan is a fantastic nonsence.''

কিন্তু কী এমন ঘটল যে তাঁরা সকলে দেশভাগের প্রস্তাব সমর্থন করে নিলেন। ১৯৪৭-এর ৩ জুন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভায় মাউন্টব্যাটেনের ভারতভাগের প্রস্তাব ও স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হলো। নেহরু, প্যাটেল, মৌলানা, গান্ধীজী, পট্টভি সীতারামাইয়া, কৃপালনী, জয়রাম দাস, জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রমুখ সকলেই উপস্থিত ছিলেন। শুধু বিরোধিতা করেছিলেন সীমান্ত গান্ধী আবদুল গাফফার খান। কৃপালনী বললেন, কোনও আলোচনা ছাড়াই ভারত ভাগের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। সারাদেশে এক হিমশীতল সর্বনাশা আতঙ্কের পরিবেশ ছড়িয়ে পড়ল।

মাউন্টব্যাটেন তো ১৯৪৮ সালের জুন মাস অবধি সময় পেয়েছিলেন তবে এত তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত তিনি নিলেন কেন? আসলে মুসলিম লিগের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে মাউন্টব্যাটেন যেমন ভয় পেয়েছিলেন তেমনি ভীত ছিলেন দেশের জাতীয় নেতৃবৃন্দ। মাউন্ট ব্যাটেন ১৯৪৭-এর এপ্রিলে লন্ডনে একটি খবর পাঠালেন, ''Speed was the only one absoluti, over helming imperative if India was to be saved. If he did not act immediately, India is going to collapse and the Raj and the Vice-Royalty will also collapse.''

জাঁদরেল জেনারেল মাউন্টব্যাটেনের এত ভয় যে রাজদণ্ড ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে শুধু দাঙ্গার জন্য। ভারত বিভাজন নরহত্যার উৎস মুখ খুলে দিয়েছিল। আড়াই লক্ষ লোকের নিধন ঘটেছিল, কত লক্ষ লোক ঘর বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছিল আজও তার হিসাব নাই।

ভারতকে ভাগ করার জন্য সিরিল র‍্যাড ক্লিফ ভারতে এলেন ৮ জুলাই, ১৯৪৭-এ। এই তাঁর প্রথম আসা। এতবড় দেশ, কত বিচিত্র প্রকৃতি, নদী-নালা, অরণ্য, পর্বত— সেই দেশকে ভাগ করা পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে সম্ভব? তিনি চেয়েছিলেন সত্যিকারের বিভাজনে ২/৩ বছর সময়। যে দেশ তিনি চেনেন না, যার সীমান্ত সম্পর্কে কোনও ধারণা নাই— তিনি ভারত বিভাজনে চলে এলেন। মাউন্টব্যাটেনের তাড়াহুড়ায় র‍্যাডক্লিফ রাজি না হয়ে তিনি জওহরলাল নেহরু ও জিন্নাকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, ''১৫ আগস্টের মধ্যেই প্রকৃত বিভাজন রেখা টানা সম্ভব? এবং এর কি প্রয়োজন আছে এত ত্রুটি পূর্ণ বিভাজনে! নেহরু ও জিন্না জোর দিয়ে বললেন এটাই করতে হবে। (Radcliffe personallay called Nehru and Jinnah and separately asked them whether it was absolutely essential to have definite partion lines, however defective, by 15 August. Both insisted it was.'' (Partitioned in haste–Shyamal Roy). সবই ছিল ক্ষমতা দখলের আকাঙ্ক্ষা। লক্ষ লক্ষ জীবনের বিনিময়ে নিজেদের ক্ষমতার দখলের অতি সক্রিয়তা মাতৃভূমিকে বিভাজনের পথে নিয়ে আনতে এদের জুড়ি ছিল না।

ভারতবর্ষে শব্দকে ব্রহ্ম বলা হয়েছে। মুখনিসৃত বাক্য কর্মপদ্ধতি ও ব্যক্তির চরিত্রকে প্রকাশ করে। জিন্না, ফিরোজ নুন, নাজিমুদ্দিন প্রমুখ লিগ নেতারা যা বলেছিলেন বাস্তবে তা করে দেখিয়েছিলেন। আর গান্ধীজী, জওহরলাল যে ঘোষণা করেছিলেন তা ব্যর্থ হয়েছিল— বাক্যগুলির এমন সারশূন্যতা যে তাঁদের চরিত্রে কোনও দাগ কাটেনি, উল্টো পথে হেঁটে ভারত ভাগ করে নিলেন তোষণের নীতি দিয়ে। ''Nehru had accepted his distraction from the path of truth and confessed it before his biographer Leonard Mosley. He told him that when the partition proposal was placed before them they were all burdened with their old age and austerity of launching for a long time made them fatigued.'' সত্যিই তো জওহরলালেরা সকলেই বয়সের ভারে ন্যুব্জ হয়ে পড়েছিলেন, ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, এমন কী পুনরায় জেলে যাওয়ার ভয় ছিল— তাই দেশ বিভাজন মেনে নিতে হলো। (Centenary year of the Partition of Bengal–Ghosh)।

সুভাষচন্দ্র তখন রণাঙ্গণে। দেশভাগ হবে তিনি বুঝতে পারছিলেন, ''From the gruelling battle field he understood the critical situation of India and act once he made speech before the nation, "Friends, we have resolved to create a united and free India, There fore we shall oppose all attempts to divide her and cut into pieces.'' এই সুভাষ কিন্তু কংগ্রেস দ্বারা বিতাড়িত হয়েছিলেন।

র‍্যাডক্লিফ ১৫ আগস্ট চলে গেলেন দেশ বিভাজনের সকল নথি ধ্বংস করে। ১৯৪৭-এর ১৭ আগস্ট, র‍্যাডক্লিফ অ্যাওয়ার্ড ধরিয়ে দেওয়া হলো। দেশ বিভাজনের অপরাধীদের হাতে।

গান্ধীজী রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্যে ঘোষণা করলেন, ''We shall have to go in for tapasya for self purification, if we want to win the hearts of the Mussalman.''

বন্দে মাতরমের বিভাজনের পরে, ১৯৪৭'-এ দেশবিভাজনের পরও তপস্যা চলছে— সে তপস্যা ভাঙেনি। বিভাজনের নায়কদের চ্যালা চামুণ্ডাগুলো আজও তপস্যা চালাচ্ছে, এক সর্বনাশা তপস্যা।

(লেখক অবসরপ্রাপ্ত সহ-প্রধান শিক্ষক)

জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে হিন্দু-ভারত

প্রীতীশ তালুকদার

আত্মমগ্ন ভারতবাসীর সাধনা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল বিদেশি হানাদার-ধর্মোন্মাদ নৃশংস দস্যুর আঘাতে, লণ্ডভণ্ড হলো সব কিছু। নালন্দা, উজ্জয়িনী, তক্ষশিলা-সহ সকল জ্ঞান সাধনার পীঠ ভেসে গেল সাধকের রক্তে। কয়েক শতাব্দী ধরে চলতে থাকল হাজারে, লাখে নির্মম হত্যাকাণ্ড, নারীহরণ ও নারী ধর্ষণ আর ধ্বংসের তাণ্ডব।

দীর্ঘ নিষ্পেষণে জড়াজীর্ণ সনাতন হিন্দু সমাজটার মানবিক গুণের বিকাশ ও ধারণের শিক্ষা ও সংস্কারের ধারা প্রায় বিলুপ্ত। উদার সনাতন জাতি হয়ে পড়ল রক্ষণশীল, অজ্ঞান, কুসংস্কারাচ্ছন্ন। ধর্মের নামে অস্পৃশ্যতা, ভেদাভেদ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, তুকতাক-তন্ত্রমন্ত্র, আর অদ্ভুত সব আচার-আচরণ ও নিয়ম হয়ে উঠল প্রধান। অতি সামান্য টোল-চতুষ্পাঠী যা গড়ে উঠেছিল তাও অযোগ্যের রুটিরুজির পথ মাত্র। শ্রীহট্ট, নবদ্বীপ, বারাণসী, কাশ্মীর, মিথিলার মতো জ্ঞানপীঠ ছিল, তবে তাও ছিল সেই সীমা ও জড়তায় আবদ্ধ। ন্যায়, স্মৃতি, অলঙ্কার, ব্যাকরণে তর্কে ঘুরপাক খাচ্ছিলো সামান্য শিক্ষাটুকুও। সব দিক থেকে ঘনান্ধকার যেন গ্রাস করেছিল সনাতন হিন্দু সমাজটাকে।

ইসলামিক শাসন হটিয়ে ব্রিটিশ শক্তির ভারত অধিকারের পর শোষণ ও শাসনের হাত থেকে হিন্দুর অব্যহতি না মিললেও পাশ্চাত্যের উন্মুক্ত শিক্ষা ও সভ্যতার আলো তাদের কাছে এসে পৌঁছালো। প্রথম বড় আশার আলো নিয়ে এল স্কট, হেয়ার এবং রামমোহন রায়ের উদ্যোগে ও বেশ কিছু রাজা-জমিদারের সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজ। বাছাই করা মেধা সম্পন্ন তরুণ-যুবকেরা সেখানে একত্রিত হলো। কিন্তু এ কী! স্বধর্মের সংস্কার করবে কী, সমাজের পাশে দাঁড়িয়ে অবলম্বন হয়ে উঠবে কী, এরা একটু ইংরাজি শিখে আর কোট-প্যান্টুলুন পড়ে সাহেবের চামচা হয়ে আখের গোছাতে লাগল, হিন্দু ধর্ম ও দেশের শত্রু হয়ে উঠল।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিক কৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেব, হরচন্দ্র ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, প্যারিচাঁদ মিত্র— এই বিখ্যাত নামগুলো তখন সেই ছাত্র তালিকায়। শিক্ষক ডিরোজিও'র অন্ধ ভক্ত তারা। পড়ছে টম পেন, টমাস ব্রাউন, বেনথাম, লক, রিড, হিউম, স্মিথ। গঠন করেছে 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন', যার পরিচিত নাম 'ইয়ং বেঙ্গল'। সকলে যখন আশা নিয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে তখন ওই শিক্ষিত তরুণরাই ইংরেজ ও খ্রিস্টানদের বড় ভক্ত হয়ে উঠে নিজ ধর্মের বিরুদ্ধেই জেহাদ ঘোষণা করল। মাধবচন্দ্র মল্লিক ঘোষণা করল 'হিন্দু ধর্ম পৃথিবীর সবচেয়ে ঘৃণ্য বস্তু'। রাস্তায় দাঁড়িয়ে গোমাংস খাওয়া, রক্ষণশীল হিন্দু বাড়িতে গো-হাড় নিক্ষেপ করা, তিলক, টিকি ও পৈতেধারীদের বিদ্রূপ করা হয়ে উঠল তাদের কাজ। এরাই হয়ে উঠল ব্রিটিশ রাজত্বের সহায়, খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারেরও। ক্ষেত্র প্রস্তুত। কলকাতায় আবির্ভাব হলো মিশনারি আলেকজান্ডার ডাফ সাহেবের। খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার শুরু হলো। তাদের অনেকে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে হয়ে উঠল কুসংস্কারাচ্ছন্ন গোরা খ্রিস্টান আর হিন্দুর খ্রিস্টানিকরণের দালাল। তবে পৈতেটা লুকিয়ে মাজায় গুঁজে রাখল। অনেকেই পরে নাকে খত দিয়ে সনাতন ধর্মে ফিরেও এসেছিল বার্ধক্যে রক্তের তেজ কমলে, ভোগের ক্ষমতা হারালে। তারপর হাজার হাজার আত্মত্যাগী সন্তানদের আত্মত্যাগে বিশাল ভারত একদিন স্বাধীন হলো, মুক্ত হলো ৬০০ বছরের ইসলামি শাসন ও ২০০ বছরের ব্রিটিশ শাসন থেকে। স্বাধীন হলো তা ঠিক, তবে ভারত ভেঙে।

খণ্ডিত স্বাধীন ভারত নিজেই ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামোর নামে ইসলামিক ও খ্রিস্টান মৌলবাদকে সংরক্ষণ দিয়ে দৈত্য করে তুলতে শুরু করল। যারা হিন্দুর সঙ্গে থাকবে না বলে পাকিস্তানের জন্ম দিল, তারা ফের বাড়তে বাড়তে ১৫ শতাংশকে পার করে গেছে আর হিন্দু নেমে এসেছে ৮০ শতাংশের নীচে। ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ ভারতের সর্বত্র শিকড় ছড়িয়ে পোক্ত হয়ে গেঁথে বসেছে। আবার হিন্দুর জীবন, সম্পদ, মেয়ে, মন্দির, বিগ্রহ আজ বিপন্ন। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, এন.জি.ও.-র নামে উগ্র ভারতবিরোধী মৌলবাদী ইসলামিক জঙ্গি সংগঠন আইসিস, জামাত, আই.এম. তালিবান, আল কায়দা'র জাল। ভারতের জাতীয় পতাকা, জাতীয় সংগীত, এমনকী আইনও হারাম হয়ে গেছে। মূর্তি হারাম তাই স্কুলে বিদ্যাসাগর, রামমোহনের মূর্তিও বসানো যাবে না। পশ্চিমে কাবা, তাই স্কুলের পশ্চিম মুখো বাথরুম ভেঙে ফেলতে হবে। সামনে যেন ১৯৪৬-এর সেই ভয়াবহ নৃশংসতার হাতছানি। কাশ্মীর ইসলামি সন্ত্রাসের গ্রাসে, সিরাজল্যান্ডের দাবি উঠেছে, বাংলা, অসম, ত্রিপুরাকে বিচ্ছিন্ন করে ইসলামিক বাংলাদেশের সঙ্গে জুড়ে বৃহত্তম বাংলাদেশ গড়ার চক্রান্ত চলছে। শরিয়ত আদালতের দাবি উঠেছে, না পেলে ফের ভারত ভেঙে মুসলমানদের দেশের দাবিও উঠে গেছে।

মাঝের ৬ বছরের বাজপেয়ী সরকার দিলে বাদ প্রায় ৯০০ বছর পর হিন্দু ভারতে ২০১৪ সালেই নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে প্রথম প্রকৃত হিন্দু জাতীয়তাবাদী, ভারতীয় ইতিহাস, ধর্ম, সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল সরকার পেয়েছে এই দেশ। এসেছে ঘুরে দাঁড়ানোর পথ। খুব জটিল সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে এখন ভারত ও ভারতের হিন্দু। ভারতের অস্তিত্ব ও হিন্দুর অস্তিত্ব দুটোই নির্ভর করছে আগামীদিনগুলোতে কারা দেশ শাসন করবে তার উপর। অলস হিন্দু এতকাল ভাবতেই চায়নি, এখন জাগরণ ঘটছে। কংগ্রেসি বা কমিউনিস্ট যেই হোন, বাড়িতে ও সমাজে আপনি হিন্দু, হিন্দু হিসাবে আপনাকেও ভাবতে হবে কী করবেন। নতুবা সে সুযোগটাও থাকবে না। মুসলমান যেখানে সংখ্যাগুরু সেখানে কংগ্রেস, কমিউনিস্ট, ধর্মনিরপেক্ষতার স্থান নাই। ওরা চেনে মোমিন আর কাফের।

আগামী বছর সুদিনের হাতছানি, তার জন্য এগিয়ে যেতে হবে। নইলে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে সংগ্রামে হিন্দুর লাশে ছেয়ে যাবে, ভারত ভাঙতে থাকবে, তারপর একদিন শেষ হয়ে যাবে। ■

মানবতাবাদী, বিপ্লবী ও মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দ

আশিস রায়

মহর্ষি শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ (১৮৭২-১৯৫০) বিশ্বসমাদৃত এক ভারত সন্তান। মানবসভ্যতার ইতিহাসে শ্রীঅরবিন্দের অবদান বহু ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। বিশ্ববাসীকে তিনি এক নতুন পথের সন্ধান দিয়েছেন। শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন একাধারে মানবতাবাদী দার্শনিক, দেশপ্রেমিক, মহাযোগী ও রাষ্ট্রচিন্তাবিদ। তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের মূল ভিত্তি মানবিক চিন্তা ও অধ্যাত্ম। রাষ্ট্র সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল বাস্তব ও স্বচ্ছ। তিনি সমকালীন রাজনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করেছেন। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তির ঔপনিবেশিক শোষণ থেকে দেশকে স্বাধীন করার সংগ্রামে তিনি শামিল হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম কাণ্ডারি। অধ্যাপক রামচন্দ্র গুপ্তের মতে, ''Sri Aurobindo will be remembered as the prophet of a pure religion of nationalism. He had the moral courage to champion the creed of absolute Swaraj for India as early as 1907।''

ভারতমাতার একনিষ্ঠ পূজারি শ্রীঅরবিন্দ স্বাধীনতা সংগ্রামে ও চরমপন্থী আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের সাংগঠনিক কাজে তিনি নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ শ্রীঅরবিন্দের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। শ্রীঅরবিন্দের মাধ্যমে ভারত তাঁর আধ্যাত্মিক বাণী বিশ্ববাসীর কাছে প্রচার করেছে। ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড. রাধাকৃষ্ণনের মতে, আধুনিক ভারতীয় লেখকদের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ হলেন সর্বাধিক সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক গুণসম্পন্ন। তাঁর মানবতাবাদী দর্শন ও আধ্যাত্মিক ধ্যানধারণা সারা বিশ্বের গুণীজনের প্রশংসা অর্জন করেছে। মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি উজ্জ্বল আশার বাণী শুনিয়েছেন। বিশ্বের দিশাহীন মানুষের মনে শ্রী অরবিন্দের বাণী আশার সঞ্চার করে।

১৮৭২ সালে ১৫ আগস্ট কলকাতার এক বিশিষ্ট বাঙালি হিন্দু পরিবারে শ্রীঅরবিন্দ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষ। পিতা ছিলেন আগাগোড়া ইংরেজ সাহেব। তবে দেশপ্রেমের মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত। দেশের স্বাধীনতার জন্য তাঁর আন্তরিকতার অভাব ছিল না। শ্রীঅরবিন্দ পিতার কাছ থেকে দেশপ্রেমের পাঠ গ্রহণ করেন।

শ্রীঅরবিন্দের মা বাঙালি হিন্দু জীবনধারায় বিশ্বাসী ছিলেন। কৃষ্ণধন ঘোষ শ্রীঅরবিন্দকে ছোটোবেলা থেকেই ইংরেজদের জীবনধারায় মানুষ করার যাবতীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ইংল্যান্ডে শ্রীঅরবিন্দ ১৪ বছর অতিবাহিত করেন। সেখানে আই সি এস পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। ইউরোপের অন্যান্য ভাষাও তিনি জানতেন। গ্রিক ও লাতিন ক্লাসিক সাহিত্যগুলির অনুশীলনে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। ব্রিটিশ সরকারের চাকরি থেকে তিনি নিজেকে সরিয়ে রাখেন। ছাত্র অবস্থায় তিনি রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হন।

১৮৯৩ সালে শ্রীঅরবিন্দ দেশে ফিরে আসেন। বরোদায় এক দশকের বেশি সময় অতিবাহিত করেন। প্রথমে প্রশাসনিক কাজে যোগ দেন এবং পরে বরোদা কলেজের সহ অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। কলেজে তিনি ইংরেজি ও ফরাসি সাহিত্য পড়াতেন। এই সময় তিনি উপনিষদ ও গীতা গভীরভাবে পাঠ করেন। বরোদায় কর্মরত থাকাকালীন তিনি চরমপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। এবং বাংলাদেশের বিপ্লবী গোষ্ঠীগুলির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। গুপ্ত সমিতি গড়ে তোলা ও বৈপ্লবিক তৎপরতা সম্প্রসারণের ওপর তিনি জোর দেন।

১৯০৪ সালে শ্রীঅরবিন্দ বোম্বাই কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং প্রকাশ্য রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। তিনি চরমপন্থীদের নেতৃত্বে ছিলেন। ১৯০৬ সালে কলকাতা কংগ্রেসে চরমপন্থীরা অধিবেশন পরিত্যাগ করেন। তিনি কলকাতায় দৈনিক 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার সম্পাদনার কাজ গ্রহণ করেন। ১৯০৭ সালে সুরাট কংগ্রেসে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে বিরোধ আরও প্রকট হয়ে পড়ে। চরমপন্থীরা তাঁর নেতৃত্বে পৃথক সম্মেলন করেন। সুরাট থেকে ফেরার পথে তিনি বরোদায় আসেন। তিনি

বিভিন্ন জায়গা পরিভ্রমণ করেন, ভাষণ দেন এবং যোগসাধনায় মনোনিবেশ করেন। নীতিগতভাবে তিনি শান্তির আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন।

তবে দেশ ও দেশবাসীর স্বার্থে তিনি বিপ্লবের পথ গ্রহণ করতে দ্বিধা করেননি। শ্রী অরবিন্দ গীতার ধর্মযুদ্ধ এবং শ্রীকৃষ্ণের কর্মযোগের আদর্শ অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন। গুপ্ত সংগঠন, অস্ত্র সংগ্রহ, ষড়যন্ত্রমূলক হিংসাত্মক কর্মতৎপরতার অভিযোগে তিনি অভিযুক্ত হন। এক বছর তাঁর কারাগারে কাটে। অবশেষে তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ায় মুক্তিলাভ করেন। কারাগারের দিনগুলি তাঁর চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন সাধন করে।

জেল থেকে মুক্তিলাভের পর তিনি উপলব্ধি করলেন যে দেশের অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। এই অবস্থায় তিনি রাজনীতি ত্যাগ করে আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করেন। তিনি প্রথমে চন্দননগরে আত্মগোপন করেন এবং অবশেষে পণ্ডিচেরী যাত্রা করেন। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের অবসান ঘটে। তিনি দার্শনিক বিষয়ে মনোনিবেশ করেন। এবং যোগসাধনা ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন। ১৯১০-১৯৫০ সালের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন— 'The Life Divine', 'Essays on the Gita', 'Savitri' ইত্যাদি। এছাড়া 'বন্দে মাতরম্', 'ধর্ম', প্রভৃতি পত্রিকায় অনেক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। শ্রীঅরবিন্দের জীবনকে শিবাজীর বিদ্রোহী জাতীয়তাবোধ তিলকের চরমপন্থী আদর্শ এবং বিপ্লবীদের গুপ্ত কর্মতৎপরতা প্রভাবিত করেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা শ্রীঅরবিন্দের মনকে নাড়া দিয়েছে। তিনি আনন্দমঠের আদর্শ অনুসরণে ভবানীমন্দির প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের বৈদান্তিক চিন্তা ও যোগদর্শন তাঁর মনকে প্রভাবিত করেছে।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর 'The Ideal of Human Unity' গ্রন্থে মানবিক ঐক্যের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। মানবিক ঐক্যসাধনই হলো রাষ্ট্রের চূড়ান্ত লক্ষ্য। তিনি ব্যক্তি মানুষের উন্নতি সাধনের ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি তাঁর রাজনৈতিক দর্শনে মানুষের আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। তিনি অধ্যাত্মচেতনা সম্পন্ন সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। শ্রীঅরবিন্দ স্বাধীনতা, সাম্য, ঐক্য, শান্তি ও সৌভ্রাতৃত্বের মধ্যে আধ্যাত্মিক সমন্বয়সাধনের সপক্ষে বক্তব্য রেখেছেন। তিনি সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে সমর্থন করতে পারেননি। তাঁর মতে, মানবতাবাদী ধ্যানধারণার অস্তিত্ব গণতন্ত্রের জনপ্রিয়তার মূল কারণ। তিনি আধুনিক কালের প্রতিনিধিমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিভিন্ন দোষ-ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি আদর্শ মানবসমাজ গড়ে তুলতে চেয়েছেন আধ্যাত্মিক প্রেরণার মাধ্যমে।

পরিশেষে বলা যায়, শ্রীঅরবিন্দ ঐক্যের আদর্শ ও মানবিক চেতনার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে চরমপন্থী আন্দোলনের তাত্ত্বিক ভিত্তি রচনার ক্ষেত্রে তাঁর অমূল্য অবদানকে অস্বীকার করা যায় না। তাঁর রাষ্ট্রচিন্তার বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধ্যানধারণার সংমিশ্রণ দেখা যায়। আধ্যাত্মিক শক্তিতে আস্থাশীল শ্রীঅরবিন্দের রাষ্ট্রদর্শনের পৃথক তাৎপর্যকে অস্বীকার করা যায় না। আধুনিককালের রাষ্ট্রদার্শনিকদের কাছে শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক মতাদর্শের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ভারতীয় তথা বিশ্বের রাষ্ট্রদর্শনে শ্রীঅরবিন্দ আধুনিক চিন্তার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছেন।

(লেখক প্রাক্তন অধ্যাপক)

(১৫ আগস্ট শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত)

With Best Compliments from -

A Well Wisher

শিল্প ভাবনায় শিং এবং দাঁত

চূড়ামণি হাটি

তিব্বতীয় তন্ত্র সাধনায় এক সময় মানুষের হাড়ের তৈরি গহনার চল ছিল। পৌরাণিক ব্যাখ্যায় দধিচী মুনির হাড় দিয়ে তৈরি হয়েছে ইন্দ্রের বজ্র। শিল্প ভাবনায় জন্তুর শরীরের অংশকে কাজে লাগানো তো স্বাভাবিক। একমাত্র কুকুর-শৃগালের চামড়াকে অস্পৃশ্য জন্তুর চামড়া হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। যুদ্ধে ব্যবহৃত ঢাল তৈরি হতো গণ্ডারের চামড়ায়। চর্মবাদ্যের মৃদু শব্দ আজ হারাতে বসেছে। ভেড়া-ছাগলের চামড়াই মূলত কাজে লাগানো হয়। চামড়ার জুতো-ব্যাগ বেশ জনপ্রিয়। আকর্ষণীয় হয়েও ৩ এপ্রিল ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে বন্য জন্তু সংরক্ষণ আইন চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হারাতে বসেছে বহুমূল্যের হাতির দাঁত নিয়ে শিল্প চর্চা। অসম এবং আফ্রিকা থেকে আসা উন্নতমানের দাঁতের অপেক্ষায় থাকতে হয়। ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশ, মহীশূর থেকেও সরকারি উদ্যোগে হাতির দাঁত আসে। খণ্ডীকর বা খোদাইকার এই শিল্পীদের বৃত্তিগত উপাধি ভাস্কর। সূত্রধরদেরই অংশ। মোষের শিং নিয়ে শিল্প কর্ম; এও সূত্রধর ভাস্করদের চর্চার অঙ্গ। জেমস্ টেলরের মতে, কোম্পানি আমলে ঢাকায় বসবাসকারী মোষের শিং ও হাতির দাঁতের কারিগররা 'খুন্দগর' নামে পরিচিত। বলা বাহুল্য, আসলে এরা মোষের শিং-এর কাজই করতো এবং জাতিতে মুসলমান। সাধারণত হিন্দু নিম্নবর্গীয় চর্মজীবী মুচিরাই মৃত গোরুর চামড়া সংগ্রহের পাশাপাশি মোষের শিং সংগ্রহ করে থাকেন।

হাতির দাঁতের কারুকাজের মধ্যে অভিজাত্য ছিল, কিন্তু মোষের শিং-এর শিল্প বস্তুর প্রতি ছিল তাচ্ছিল্য। একসময় ঢাকায় তাঁতিবাজারে যেসব তাঁতি মোষের শিং-এর মাকু ব্যবহার করতেন তাদের অন্যেরা ঘৃণা করতো। যদিও মোষের শিং দিয়ে তৈরি শিঙ্গা আদিম সংকেতসূচক ফুৎকার বাদ্য। অবশ্য বর্তমানে পিতল-তামার শিঙ্গাই বেশি প্রচলিত। তৈরি হচ্ছে বৃহদাকার রামশিঙ্গা। মোষের শিং দিয়ে তৈরি হয় ছোট্ট চাকুর খাপ, কাগজ কাটার ছুরি, ছুরির বাঁট, লাঠির হাতল, ফুল, চামচ, চিরুনি, পেনদানি, গহনার বক্স, সাপ-পাখি এবং নানা শখের শিল্প বস্তু। মোষের শিং করাত-ব্লেড দিয়ে মাঝ বরাবর চেরা হয়। ডগার অংশটি খেলনা তৈরিতে, আর গোড়ার দিকটি চিরুনি তৈরিতে কাজে লাগে। আগুনের তাপে শিং সোজা করে ফাইল দিয়ে ঘসে ঘসে মসৃণ করতে হয়। প্রয়োজনে মেশিনের সাহায্য নেওয়া হয়। মধ্যপ্রদেশের বস্তার এই শিল্প চর্চাটি ধরে রেখেছে। পশ্চিমবঙ্গে মেদিনীপুর জেলার বৈষ্ণবচক, কলাগাছিয়া, জ্যোতঘনশ্যাম, ডোঙাভাঙ্গা, মাগুড়িয়া, হাওড়ার দেউলগ্রাম, হুগলীর সেনহাটি, বাদনগঞ্জের নাম এই শিল্প প্রসঙ্গে উঠে আসে। হাতির দাঁতের কারুকাজ হয় মুর্শিদাবাদের খাগড়া, বহরমপুর ও জিয়াগঞ্জে। কলকাতা ও দার্জিলিং-এ হাতির দাঁতের শিল্পকে ঘিরে বেশ উৎসাহ রয়েছে। প্রথম থেকেই এ শিল্পের মূল ঘরানা উপহারের নিমিত্ত দ্রব্যাদি নির্মাণ।

প্রচলিত মত, রাজশক্তির তত্ত্বাবধানে হাতির দাঁত দিয়ে কারুকাজে পারদর্শী শিল্পীদের দিল্লি থেকে মুর্শিদাবাদে নিয়ে আসা হয়েছিল। লালবাগ, জিয়াগঞ্জ ও খাগড়ায় এরা বসবাস শুরু করেন। অন্য একটি গ্রহণযোগ্য মত হলো, হাতিদাঁতের শিল্পকর্মে সুনাম অর্জনকারী শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরার শিল্পীরা তাদের শিল্পকর্ম দিয়ে নজর কেড়েছিল মুর্শিদাবাদের নবাবদের। শোনা যায় এঁদের কাছে কাজ শিখে তুলসী মিস্ত্রি ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে নাগাদ জিয়াগঞ্জে এন্টালিবাগে প্রায় কুড়ি জন শিল্পীকে নিয়ে সাংগঠনিক উদ্যোগ নেন। পরবর্তীকালে হাল ধরেন তার পুত্র রামকিশোর মিস্ত্রি। মসৃণ আর উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণই ছিল এ শিল্পের মূল আকর্ষণ। হাতির দাঁতের প্রসাধনি কৌটো, ময়ূরপঙ্খি নৌকা, হাতির মিছিল, চিরুনি, বোতাম, ছুরির বাঁট, দাবার ঘুঁটি, মালা, আংটি এমনকী তৈরি হয়েছে হাতির দাঁত থেকে পাতলা আঁশ তুলে শীতল পাটির কারুকাজ। শিং-এ আপত্তি আছে, কিন্তু হুকোর মুখের নল হাতির দাঁত দিয়ে তৈরি হলে আপত্তি নেই। প্রয়োজন এবং নান্দনিকতা পাশাপাশি অবস্থান করেছে এই শিল্প ভাবনায়। অচল পরিকাঠামো ও উৎসাহের অভাবে এ শিল্পগুলি লুপ্ত প্রায়। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

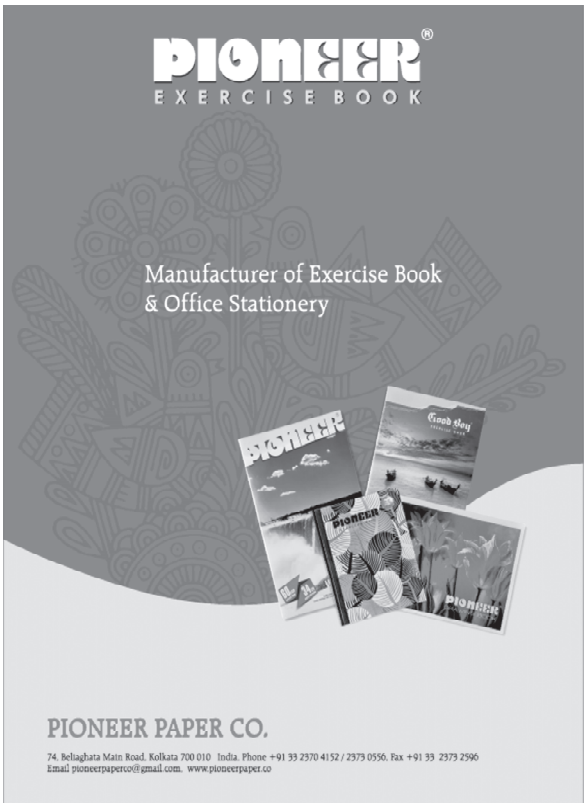

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

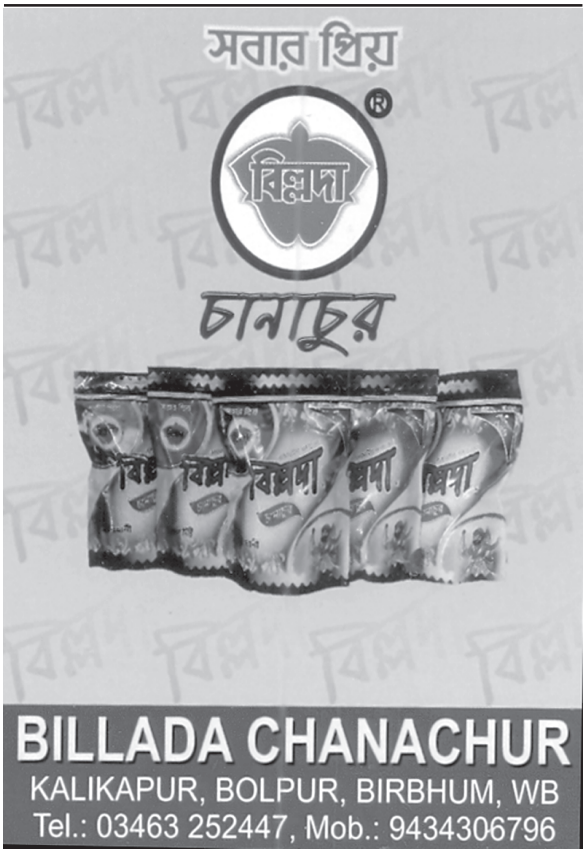

ভাগ্যবানের গপ্পো

হিমাদ্রি দাস

ঘটনাটা মনে পড়লে এখনও আমার রোমকূপ খাড়া হয়ে যায়। স্রেফ আমার ভাগ্য ভালো তাই বেঁচে ফিরে আসতে পেরেছিলাম। যাই হোক, গোড়া থেকেই বলি—

তিন-চার মাস আগেকার কথা। কিছুদিন আগে ভোটরঙ্গের দামামা বেজে গেছে। কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিয়েছেন আমাকেও অংশ নিতে হবে এই নাটকে। সুতরাং একদিন এক শুভক্ষণে ভোটের সামগ্রী সংগ্রহ ও জমা দেওয়ার কেন্দ্রে হাজির হলাম। আমাদের দলের সবাই একে একে এসে উপস্থিত হলো। কাজের হ্যাপা কম নয়। ভোটের জিনিসপত্র সংগ্রহ করা, মিলিয়ে দেখা। সব শেষ করে বেরিয়ে যাব, ঠিক সেই সময় আবার ডাক পড়ল। কাউন্টারে ছুটলাম। কাউন্টারের কর্মী বেজার

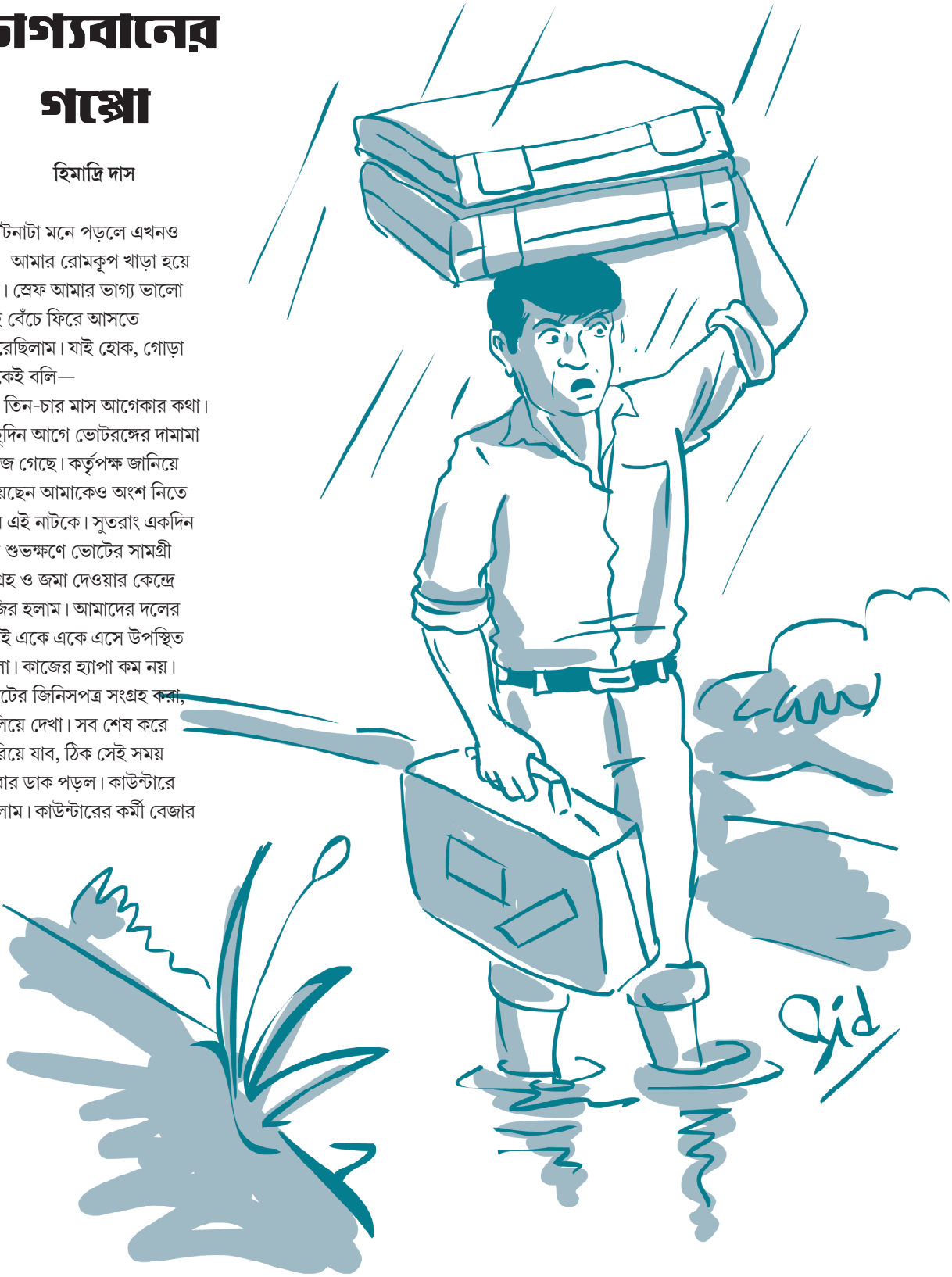

মুখে জানালেন, আমি নাকি ভুল বুথের মালপত্র নিয়েছি। আমার তো মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার মতো অবস্থা। দেখলাম বোর্ডে তখনও আমার পোলিং পার্টির নম্বরের পাশে পোলিং স্টেশনের নাম আর নম্বর জ্বলজ্বল করছে। মানে আমাকে আবার নতুন করে মাল নিতে হবে।

ওদিকে ঘড়িতে তিনটে বাজতে না বাজতেই আকাশ কালো করে মেঘের আনাগোনা শুরু হলো। কাজ তখনও অনেক বাকি। বুক দুরুদুরু করছে। অন্যান্য পোলিং পার্টিরা যে যার বাড়ির পথে। এলাকা প্রায় ফাঁকা। মাথার ওপর মেঘ।

মালপত্রের হিসাব বুঝে নিয়ে রওনা দেওয়াই যেতো। কিন্তু সঙ্গে পুলিশ চাই। পুলিশ ছাড়া যাওয়া যাবে না। অগত্যা সেই মহার্ঘ বস্তুর সন্ধান শুরু হলো। ঘড়িতে তখন চারটে বেজে গেছে। পুলিশ জোগাড় হতে হতে আরো ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। আর ওদিকে কালো মেঘ ভেঙে অঝোরে বৃষ্টিও নেমে গেল। সঙ্গে শুরু হলো ঝড়।

সন্ধ্যের পর সবাই যার যার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে চলে গেল। একা আমরা অব্যবস্থার শিকার হয়ে ভোটসামগ্রী সংগ্রহ ও জমা দেবার কেন্দ্রে আটকে থাকলাম।

বৃষ্টি আর ঝড়ের সে কী তাণ্ডব। সে তাণ্ডব থামতে চায় না। আমাদের সঙ্গে ব্যালট বাক্স, তাড়াতাড়া কাগজের ফর্ম, খাম আর গণতন্ত্রের বেদিতে যে পুজো হবে সেই পুজোর সবচেয়ে দামী সামগ্রী— ব্যালট পেপার। বৃষ্টির হাত থেকে এগুলো রক্ষা করাই বড় দায়। এক এক সময় মনে হতে লাগলো ভোটকেন্দ্রে বোধহয় আর পৌঁছতেই পারবো না।

কাজ শেষ করতে অনেকটাই দেরি হয়ে গেল। গাড়ি তৈরিই ছিল। বৃষ্টি একটু থামতেই আলো ছেড়ে, মাথার উপরের নিশ্চিত ছাউনি ছেড়ে অন্ধকার আর অনিশ্চয়তার দিকে রওনা হয়ে গেলাম।

সামনে বিপুল কাজের বোঝা। রাত পোহালেই শুরু হয়ে যাবে গণতন্ত্রের দেবতার অর্চনা। আমাদের গাড়ি গলিপথ ঘুরে একটা সরু বাঁকের সামনে এসে দাঁড়ালো। সামনে পথ এতটাই সরু যে গাড়ি আর যাবে না। বাকি পথটা হেঁটেই যেতে হবে। সঙ্গের পুলিশ কর্মী আমাদের নামতে বারণ করে নিজেই গেলেন বুথ দেখতে। তাঁর ফিরে আসার অপেক্ষায় পথ চেয়ে বসে আছি। এমন সময় এক স্থানীয় ব্যক্তি এসে উপস্থিত। বললেন গাড়ি আর যাবে না। হেঁটেই যেতে হবে। মুখ থেকে মদের কটু গন্ধ বার হচ্ছে। বার বার গাড়ি থেকে নামতে বললেন। পুলিশ কর্মীটির কোনো পাত্তা নেই। সমস্ত দরকারি কাগজপত্র আর ব্যালট পেপারের বাণ্ডিলগুলো বুকের কাছে নিয়ে বসে আছি। কেমন যেন ভয় করতে লাগলো। সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় আমরা পাঁচজন পোলিং অফিসার বসে আছি। সঙ্গে একজন সিভিক ভলান্টিয়ার। তার অবস্থা আমাদের থেকে ভালো কিছু নয়।

আরও কিছুক্ষণ পর অপেক্ষা শেষ হলো। সেই পুলিশ কর্মী অবশেষে ফিরলেন। কিন্তু ফিরে এসে যা বললেন তাতে সমস্ত উৎসাহ একেবারে শেষ হবার জোগাড়। 'স্যার কী করে যাবেন? যাওয়া যাবে না। রাস্তা বলে আর কিছু নেই। কম করে পাঁচ মিনিট হাঁটতে হবে। ভীষণ কাদা।' —একথা শুনে দায়িত্বপ্রাপ্ত ঊর্ধ্বতন অফিসারকে মুহুর্মুহু ফোন। ফোনে আর কীই বা সাহায্য পাওয়া যাবে? এক সময় ফোন গেল কেটে। বেশ বোঝা গেল বাকি পথটুকু পায়ে হেঁটে ভগবানের ভরসায় যেতে হবে। বৃষ্টি তখনও টিপটিপ, আকাশের মুখ ভার। কাঁধে গণতন্ত্রের বিশাল বোঝা। আবার যদি বৃষ্টি আসে মুশকিল। আরও দেরি হলে বড়ো বিপদ হয়ে যাবে। দরকারি কাগজপত্রের দুখানা ব্যাগ নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে সবার আগে হাঁটা দিলাম। একটু এগিয়েই দেখি ইঁট সিমেন্টের পথ শেষ। কাঁচা রাস্তা শুরু। এক ঘণ্টার বৃষ্টিতে হাঁটুর কাছাকাছি উচ্চতার কাদা তৈরি হয়ে গেছে। জুতো খুলে নেমে পড়া ছাড়া উপায় নেই। যেমন কাদা, তেমনই পিচ্ছিল। গণতন্ত্রের দেবতা আমাদেরকে আরও এক পরীক্ষার সামনে ফেলে দিলেন। পিচ্ছিল পথে পিছল খেতে খেতে মাতালের মতো এগিয়ে যাচ্ছি। পা হড়কে পড়ে গেলে শেষে ভোটই না ভণ্ডুল হয়।

কোথায় রকমারি নামের, রকমারি পদ আলো করে থাকা দায়িত্ব প্রাপ্ত অফিসারেরা, কোথায় কমিশন? কোথায় তাঁদের বরাভয়, আশ্বাসবাণী...? বর্ষায় এই পথে ভোটকর্মীদের দিশাহারা অবস্থায় ছেড়ে দিতে কারো এতটুকু বাধলো না।

অবশেষে সেই মাতাল এসেই আমার হাত ধরলো। বল পেলাম। পিছল খাবার ঝোঁক কমলো। বৈতরণী পার হলাম।

বারোশত ভোটার যে ঘরে ঢুকে তিনটি করে ভোট দেবেন সেই ঘরের আকার দেখে তো চোখে জল আসার জোগাড়। সে ঘরে না আছে একটির বেশি জানালা, না আছে একটির বেশি দরজা। ঘরের লাগোয়া না আছে বাথরুম। জলের কল থাকলেও রাতে কাদা পথে তা ব্যবহার করা মুশকিল।

রাতে মোমবাতি ভরসা করে সব কাজ শেষ করতে হলো। পরদিন যথাসময়ে ভোট শুরু হলো। ছোট্ট ঘরে অপ্রতুল জায়গায় কোনোরকমে সবার বসার জায়গা, ব্যালট বাক্স রাখার জায়গা, ভোটদান কক্ষের জন্য জায়গা— সবকিছু ঠিক করার পর প্রিসাইডিং অফিসারকে যে অনাকাঙ্ক্ষিতই মনে হবে তাতে তেমন আশ্চর্যের কিছু নেই। ভোটারদের যাতায়াতের দরজার পাশে কোনো রকমে টেবিল সাজিয়ে বসতে হলো। টেবিলের তলায় আর বাঁদিকে যেখানে ব্যালট পেপার রাখার ব্যবস্থা হলো সেদিকেই আবার পোলিং এজেন্টদের বসার জায়গা।

ভোট শুরু হতেই লাইন বাড়তে থাকলো। একটি করে ভোট দিয়ে আবার পরের ভোট। ভোটারদের মধ্যে বিভ্রান্তি, ধাক্কাধাক্কি, পোলিং এজেন্টদের মধ্যে ঝগড়া, কেউ কাউকে 'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যাগ্র মেদিনী' মনোভাব নিয়ে তৈরি। এতো গেল ভিতরের কথা, বাইরে তখন লাইনে মহিলাদের মধ্যে ঝগড়া লেগে গেছে। ভিতর- বাইরের চিৎকার আর বিশৃঙ্খলায় টেকা দায়। পুলিশ আর সিভিক ভলান্টিয়ারের প্রাণও যায় যায়। ভিতর আর বাইরের চিৎকার আর জটলা যেমন বাড়তে লাগলো তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে কথা আর

সূর্যের উত্তাপও বাড়তে থাকলো। কোনোটাই নিয়ন্ত্রণে এলো না। পুলিশ কর্মীদের বারবার বলেও লাভ হলো না। অগত্যা নিজেই জোড় হাতে ছুটে বার হলাম। মহিলাদের উদ্দেশ্যে কাতর মিনতি জানাতে লাগলাম। গণতন্ত্রের দেবতার পুজোয় আজ আমি প্রধান পুরোহিত। ফল যা হলো তা সাময়িক। ভোট শুরুর পর সুষ্ঠুভাবে ভোট চালানোর তাগিদে কতোবার কতো জনের কাছে জোড় হস্তে ছুটে গেছি তার হিসাব আমার কাছেও ঠিকঠাক নেই।

বিশৃঙ্খলার মাঝে সেক্টর অফিসারের মুখখানা মনে পড়ছিল। সকালবেলা ভোট শুরুর আগে আমার অসহায়তা আর আশঙ্কার কথা শুনতে শুনতে তাঁর ভিতরটাও হয়তো একইরকম অসহায়তা আর আশঙ্কায় ভরে যাচ্ছিল। বলেছিলাম, বারোশো মানুষ ভোট দেবেন। এতো ছোট ঘর কেন বাছলেন? জানালা মাত্র একখানা। সারাদিন আলোর কী ব্যবস্থা হবে? তিনি উত্তরে বললেন, অনেক বার রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন। তবুও এই জায়গাতেই...। সব রকম সাহায্যের আশ্বাস দিয়ে তিনি চলে গেলেন।

রঙ্গ সারাদিন চলতে থাকলো। রঙ্গ না যুদ্ধ? কখনও এলো মদ খেয়ে মাতলামি করা মাতাল। মুখে অশ্রাব্য গালিগালাজ। কখনও এলো মানসিক ভারসাম্যহীন উন্মাদ। ভোটদান কেন্দ্রে সকলের অবারিত দ্বার। সইতে হলো চোখ রাঙানি আর আস্ফালন। এ দেবতার পুজোয় সবার সমান অধিকার।

ভোটদান প্রক্রিয়া তবু একবারের জন্যেও থামেনি। একটু একটু করে বিকাল হয়ে এলো। দুপুরের লাইন বিকেলে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হলো। ভোট কেন্দ্রের সামনে ছোটো মাঠে যেন জনসমাবেশ চলছে। যেদিকে তাকানো যায় মানুষ আর মানুষ। লোকে লোকারণ্য। আলো পড়ে আসছে, এদিকে চাপ আরও বাড়তে লাগলো। পাঁচটার সময় লাইনের শেষ দেখতে গিয়ে ভোটকেন্দ্র থেকে অনেকটা দূরে গিয়ে পড়লাম। লাইনে তখন প্রায় তিনশো জন অপেক্ষমান। কাকে ছেড়ে কাকে স্লিপ দেব। বাইরের আলো তখন প্রায় নিভে এসেছে। টিমটিমে ইমারজেন্সি আলোয় ভোট চলতে লাগলো। বাইরের মাঠে হল্লা চলছে। ভিতরের বারান্দায় হল্লা, ঘরের ভিতরেও হল্লা। আমার ছোটো টেবিলটার উপর কাগজপত্র রাখা। এবার সেই টেবিলটার উপরও ভোটারের ঢেউ এসে আছড়ে পড়তে লাগলো। যা হোক করে টেবিলটা আগলাতে থাকলাম। সারাদিন ডানদিকে বেঁকে বসে থাকতে থাকতে পিঠে আর কোমরে যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। ঘড়ির কাঁটায় আটটা ছুঁই ছুঁই। তখনও ভিড় পাতলা হয়নি।

দুইজন নিরাপত্তাকর্মী আছেন। কিন্তু তাঁরা বাইরের লাইন সামলাতেই হিমসিম খাচ্ছেন। ঘরের ভিতরের পরিস্থিতি দেখবার সময় তাঁদের কোথায়? তাঁরা বারবার অসহায়ের মতো আত্মসমর্পণ করে বলতে থাকলেন— আমাদের কথা কেউ শুনছে না। এই রাতে ব্যালট পেপার আর ব্যালট বাক্স নিয়ে আমরা যেন অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছি। ভোটারের শেষ নেই। মাঝে মাঝে অজানা আশঙ্কা আর এক অদ্ভুত অসহায়তা ঘিরে ধরতে লাগলো। আমরা এই ক'জন সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় বিশৃঙ্খল জনতার মাঝে কি তাহলে এবার আটকা পড়ে গেলাম? বিপন্নতা গ্রাস করলো। রাতের অন্ধকার আর সেই অন্ধকার খানখান করে দেওয়া জনতার চিৎকারে সে বিপন্নতা বেড়েছে বই কমেনি।

এমনি ভাবেই একসময় ভোট শেষ হলো। ঘড়িতে তখন নয় নয় করে প্রায় বারোটা বাজে। নাহ্। ছাপ্পাভোট পড়েনি। বুথ জ্যাম হয়নি। ব্যালট পেপার ছিনতাইও হয়নি। গুলি বা বোমার আওয়াজও শোনা যায়নি। ওগুলো নিন্দুকের প্রচার। তবে ওগুলো হলেও করার কিছুই থাকতো না। বাধা দেবার কেউ ছিল না। বুথের মধ্যে যখন বেশ ভিড়, তখন সেই অবস্থাতেও সব কাগজপত্র ভোটার আর পোলিং এজেন্টদের ভরসায় ফেলে রেখে বাইরে যেতে হয়েছে। হাত বাড়ালেই সব কিছু নাগালের মধ্যে। একজন মাত্র সিভিক ভলান্টিয়ার ভিড়ের মধ্যে পাহারায়। ব্যালট পেপারের একটা বা দুটো বান্ডিল বা একগোছা ফর্ম যদি কোনো পাগল বা মাতাল দইয়ের হাঁড়ি থেকে দই তুলবার মতো করে খাবলা মেরে তুলে নিয়ে দে দৌড় লাগাতো কিছু কি করার থাকতো? যদি রাতের অন্ধকারে বোমাবাজি শুরু হতো বা গুলি চলতো কিছু কি করার থাকতো? কিছুই ঘটেনি। শুধু রাতের দিকে খবর এলো কাছাকাছি কোনও এক জায়গায় একজন খুন হয়েছেন।

মধ্যরাতে শুনশান রাস্তা ধরে গাড়িটা এসে থামলো নির্বাচনী সামগ্রী জমা দেবার কেন্দ্রে। নিজেকে ভাগ্যবান মনে হলো। উপস্থিত আধিকারিকরা মাল জমা নেবার সময় বললেন যে জায়গাতে আমরা ছিলাম সেই জায়গাটা নাকি বিশেষ ভালো নয়। গণ্ডগোলের আখড়া। তখনও নিজেকে ভাগ্যবান মানলাম। নিজেকে আরও ভাগ্যবান মনে হলো যখন জানালাম আমার বন্ধুপ্রতিম শিবুদার বুথে বেলা তিনটেতেই ভোট শেষ হয়ে গেছে। কয়েকজন মিলেই নাকি সকলের কাজ এক্কেবারে সহজ করে দিয়েছে। নিজেকে আবারও ভাগ্যবান মানলাম যখন শুনলাম দীপুবাবুর ব্যালট পেপার হাওয়া হয়েছে, সেই হাওয়া হওয়া ব্যালট পেপার আবার যথাসময়ে নাকি ফিরেও এসেছে। আর পার্থদার বুথেও নাকি কারা যেন একই ভাবে সব ভোট সুষ্ঠুভাবে দিয়ে দিয়েছে। পার্থদা প্রতিবাদ করতে গিয়ে হঠাৎ তাদের কোমরের কাছে কী একটা করে গোঁজা আছে দেখতে পেয়ে কী জানি কী ভেবে চুপ করে গেছে।

নাহ্। আমার তেমন অভিজ্ঞতা হয়নি। তবে নিজেকে সবচেয়ে ভাগ্যবান মনে হলো তখনই যখন শুনলাম সন্ধ্যার কিছু পরে বুথ থেকে বেরিয়ে আমারই মতো কেউ একজন আর ফিরে আসেনি। পরে তার লাশটা পাওয়া গিয়েছে রেললাইনের ধার থেকে। আমিও তো সন্ধ্যার পর একবার বুথ ছেড়ে বেরিয়েছিলাম। আমি সত্যিই ভাগ্যবান। গণতন্ত্রের দেবতার পুজোয় পুরোহিত আমি নই। শুধুই বলির পাঁঠা। তবুও কেন জানি না কেবলই মনে হচ্ছে আমি বড্ড ভাগ্যবান। ■

বীর ভীল-বালক দুদ্ধা

আরাবল্লী পাহাড়ের একটি গ্রাম। বন-জঙ্গলে ঢাকা। অরণ্য বেষ্টিত গ্রামের বাসিন্দারা সবাই ভীল। খুব গরিব। শিকার লব্ধ প্রাণীই তাদের আহার্য। বর্ষাকালে যখন শিকার পাওয়া কঠিন তখন জংলিঘাসের রুটিই তাদের একমাত্র সম্বল হয়ে দাঁড়াত। শরৎকালে জংলি ঘাসের বীজ সংগ্রহ করত আর বর্ষাকালে তা পিষে আটার মতো তৈরি করে তার রুটি খেয়ে খিদের জ্বালা মেটাত গ্রামের লোকেরা।

ওই গ্রামে বাস করতেন পুঞ্জা ভীল ও তাঁর স্ত্রী। দুদ্ধা ছিল তাঁদের একমাত্র পুত্র। পুঞ্জা ভীল রাণাপ্রতাপের অঙ্গরক্ষক বাহিনীতে কাজ করতেন। ১২/১৩ বছরের দুদ্ধা ও তার মা কেউই রাণাপ্রতাপকে চোখে দেখেনি। পুঞ্জা ভীল স্ত্রী পুত্রকে রাণাপ্রতাপের বীরত্বের কাহিনি শোনাতেন। বাবার মুখে সেই কথা শুনতে শুনতে দুদ্ধা নিজের মনে রাণাপ্রতাপের কাল্পনিক চিত্র গড়ে তুলত আর উত্তেজিত হয়ে পড়ত।

সে সময় মহারাণার দুর্দিন চলছিল। জঙ্গলে জঙ্গলে, গিরি-গুহা-কন্দরে তাঁকে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছিল। আকবরের মোগল সেনারা তাঁকে ধরার জন্য চারিদিক ছেয়ে ফেলেছিল। এমনও হয়েছে উনুনে বসানো রুটি ফেলে পালিয়ে যেতে হয়েছে। এজন্য দু'তিন দিন তাঁর ভাগ্যে খাবার জুটত না।

দুদ্ধার বাবা পুঞ্জা ভীল ধন্য। এমন শোচনীয় পরিস্থিতেতেও রাণাপ্রতাপকে তিনি ছেড়ে যাননি। এই ভয়ংকর বিপদের দিনে রাণাপ্রতাপও বিদেশি আক্রমণকারীর সামনে মাথা নত করেননি। একদিন মহারাণা প্রতাপের জীবন রক্ষা করতে গিয়ে পুঞ্জা ভীল মোগল সৈনিকদের হাতে মৃত্যুবরণ করলেন। ভীষণতম আঘাতেও যে রাণার চোখ দিয়ে জল বেরোত না,

অঙ্গরক্ষক পুঞ্জা ভীলের মৃত্যুতে তিনিও বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। সেদিন তিনি যত কেঁদেছিলেন, জীবনে আর কখনও তেমনটা কাঁদেননি।

এ রকমই চলছিল দিন। দুদ্ধা ও তার মা কোনওরকমে দিন কাটাচ্ছিল। একদিন মহারাণা প্রতাপ পালাতে পালাতে তাদের গ্রামের বাইরের একটি পাহাড়ে এসে হাজির হলেন। একটি গুহায় আশ্রয় নিয়েছেন তিনি। একজন ভীল এসে দুদ্ধার মাকে রাণাপ্রতাপের আগমন সংবাদ শুনিয়ে গেছে। রাণার সংবাদে নিজের স্বামী ও মহারাণার স্মৃতি তাঁর অন্তরে জেগে উঠল। 'আমাদের রাণার এখন বনবাস চলছে। থাকা-খাওয়ার কোনও সুব্যবস্থা নেই' —এসব চিন্তা করে খুবই বিচলিত হয়ে পড়লেন দুদ্ধার মা।

অত্যন্ত বিশ্বস্ত কয়েকজন ভীলের ঘর থেকে প্রতিদিন রাণার জন্য খাবার যেত। দুদ্ধার মা-ও রাণার জন্য খাবার পাঠাতেন। কাউকে না পাওয়া গেলে ছোটো দুদ্ধাকেই পাঠাতেন। একদিন তাঁর খাবার পাঠানোর কথা , কিন্তু সেদিন ঘরে যে কিছুই নেই। মা খুব ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। মায়ের কষ্ট দুদ্ধার মনেও দাগ কাটল। মাকে কিছু না বলে দুদ্ধা বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে। প্রতিবেশীর ঘর থেকে আটা চেয়ে এনে রুটি তৈরি করে মা দুদ্ধার খোঁজ শুরু করল। বেশ কিছুক্ষণ পর দুদ্ধা ঘাসবীজের বোঝা নিয়ে হাজির হয়ে বলল, মা ঘাসবীজের রুটি তৈরি করে দাও, আমি রাণার জন্য খাবার নিয়ে যাব। অকারণে ছেলের ওপর রাগ করার জন্য মা অনুতপ্ত হয়ে শান্তস্বরে বলল, রাণার জন্য আমি রুটি তৈরি করে রেখেছি, তুমি তড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়। তাঁর হয়তো খুব খিদে পেয়েছে।

খুশিতে ডগমগ হয়ে দুদ্ধা রুটির পুঁটলি নিয়ে দৌড়তে শুরু করল। সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। একজন মোগল সেনা দূর থেকে তাকে দেখতে পেয়ে থামতে বলল। দুদ্ধা সে কথা না শুনে ছুটতে লাগল। মোগল সেনাটি পলায়নরত দুদ্ধার দিতে তরোয়াল ছুঁড়লো। তাতে দুদ্ধার বাঁ হাতটি কেটে পড়ে গেল। রক্ত ঝরছে, ব্যথা হচ্ছে, রুটির পুঁটলি নিয়ে তবু দুদ্ধা ছুটতে লাগল। 'রাণাজী, মা আপনার জন্য রুটি পাঠিয়েছে' বলে চিৎকার করে পড়ে গেল দুদ্ধা। চিৎকার শুনে রাণাপ্রতাপ গুহার বাইরে এসে সব দেখে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। দুদ্ধা কোনও রকমে বলল, মা আপনার জন্য রুটি পাঠিয়েছে। তারপর চিরকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল দুদ্ধা। রাণাপ্রতাপ যখন জানতে পারলেন ওই বালক তাঁর অঙ্গরক্ষক, প্রাণরক্ষক প্রিয় পুঞ্জার পুত্র, তখন তাঁর চোখে নেমে এল বাঁধভাঙা জল।

এভাবেই ছোটো দুদ্ধা মেবারের ইতিহাসে বলিদানী পরম্পরায় রাণাপ্রতাপের সঙ্গে নিজের নাম যুক্ত করে গেছে।

প্রতাপনারায়ণ মিশ্র

ভারতের পথে পথে

রাজমহেন্দ্রী

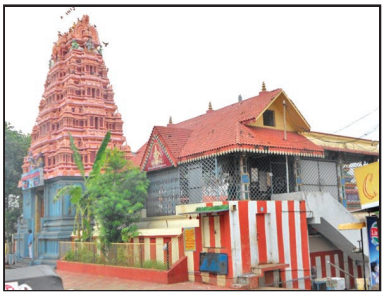

অন্ধ্রপ্রদেশে গোদাবরীর পূর্ব তীরে রাজমহেন্দ্রী শহরে মার্কণ্ডেয় স্বামী ও কোটিলিঙ্গেশ্বর মন্দির দু'টিতে সারা বছর পুণ্যার্থী ও পর্যটকদের ভিড় লেগেই থাকে। মার্কণ্ডেয় মন্দিরে হর-পার্বতী, নারায়ণ ও সূর্যদেবতা এবং দুই কিলোমিটার দূরে দশম-একাদশ শতাব্দীর কোটিলিঙ্গেশ্বরে লিঙ্গরূপী মহাদেব বিরাজমান। মন্দির দ্রাবিড়ীয় স্থাপত্যে নির্মিত। প্রতিটি মন্দিরে বিষ্ণুর দশ অবতারের মূর্তি রয়েছে। গোদাবরী এখানে সপ্তধারায় বিভক্ত হয়ে সাগরে মিশেছে। গৌতম মুনির দুর্ভিক্ষ দূরীকরণের স্মারক রূপে এখানে প্রতি বারো বছর অন্তর বারো দিনের মেলা বসে। এসময় সারা ভারত থেকে যাত্রীরা আসেন। মা সারদা এখানে এসেছেন। রাজমহেন্দ্রীর চন্দনজাত সম্ভার ও কার্পেট পৃথিবী বিখ্যাত।

জানো কি?

- ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ আসলে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম।
- বীর সাভারকর প্রথম এ বিষয়ে জাতিকে অবহিত করান।
- নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক ছিলেন।
- নেতাজী আন্দামান ও নিকোবর থেকে ব্রিটিশদের উৎখাত করে শহিদ দ্বীপ ও স্বরাজ দ্বীপ নাম রাখেন।
- পাকিস্তানের গ্রাস থেকে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গকে ছিনিয়ে আনেন।

ভালো কথা

বারন্দার কার্নিশে ঘুঘুর বাসা

ক'দিন আগে হঠাৎ দেখি আমাদের বাড়ির বারন্দার কার্নিশে দুটো ঘুঘুপাখি কোথা থেকে খড়কুটো এনে বাসা বাঁধছে। ক'দিন পরে মা ঘুঘু বাসায় দুটো ডিম পেড়েছে। তারা পালা করে ডিমে তা দিচ্ছে। তার বেশ কদিন পরে আমি যখন ঘরে পড়ছিলাম, বারন্দায় চিঁ চিঁ শব্দ পেয়ে গিয়ে দেখি ডিম দুটি থেকে দুটি ছানা বেরিয়েছে আর মা ও বাবা পাখি ছানা দুটির মুখের ভিতর ঠোঁট ঢুকিয়ে খাবার খাওয়াচ্ছে। খেয়েই আবার হাঁ করে চিঁ চিঁ করছে। আমি রোজ ছানা দুটোকে দেখতাম, ওরা আমাকে মোটেও ভয় পেত না। আরও কদিন পরে ছানা দুটো বড়ো হয়ে উড়ে গেল। কিন্তু আজ আবার ঘুঘু দুটো ওখানেই বাসা বানাতে শুরু করেছে। বাবা বলল, 'ওরা আবার ডিম দেবে, ওদের বিরক্ত করো না। ওরা হয়তো ছানা বড়ো করার জন্য এ জায়গাটি নিরাপদ মনে করেছে।' তাই আমি এখন খুব খুশি।

রূপষা দেবনাথ, অষ্টম শ্রেণী, বিরাটি।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) ন হী ন জ্ঞা হি তা হি	(১) ণ নি বে দি প্রা ত
(২) ম্ব ম স র্ম ধ স র্ব	(২) ম্ ব মা ন্দে ত র

৩০ জুলাই সংখ্যার উত্তর

(১) সন্তানসন্ততি (২) শতবর্ষজীবী

৩০ জুলাই সংখ্যার উত্তর

(১) লতাবিতান (২) হরসুন্দরী

উত্তরদাতার নাম

(১) শঙ্খশুভ্র দাশ, সোনারপুর, দঃ ২৪পরগনা। (২) স্বাতী মিশ্র, শোভানগর, মালদা। (৩) ইমন হাজরা, দুর্গাপুর, পঃ বর্ধমান। (৪) সৌভিক সাঁতরা, বেলিয়াতোড়, বাঁকুড়া।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - **7059591955**
E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা।। অভিমন্যু।। ২০

অভিমন্যু এরপর বীরযোদ্ধা শল্যকে দারুণ আঘাত করলেন।

শল্যর ভাই এগিয়ে এলেন।

অভিমন্যু একটি মাত্র তীর ছোঁড়েন...

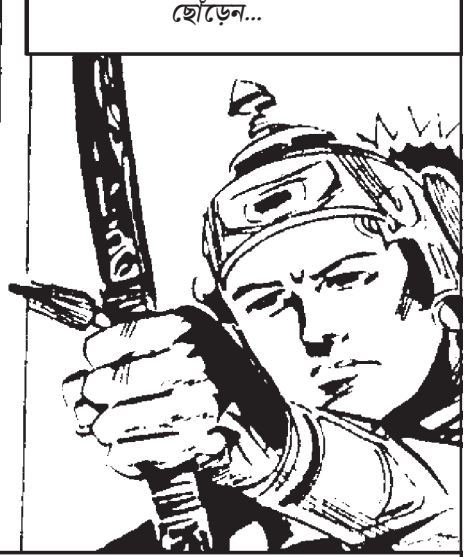

সঙ্গে সঙ্গে রথটি ভেঙ্গে পড়ে।

স্বাধীন ভারতে সর্বোত্তম চ্যাম্পিয়ন ভি.সি.আনন্দ

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর সাত দশক অতিক্রান্ত। এই সত্তর বছরে দুনিয়া জুড়ে ঘটে গেছে কতই বিচিত্র ঘটনা। চাঁদ থেকে মঙ্গলগ্রহ দূর দূরান্তরের গ্রহ-নক্ষত্রও আজ মানুষের চিন্তা-কর্মের অধীন। মাউন্ট এভারেস্ট থেকে রকি পর্বত--- ছয় মহাদেশের সব সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ জয় করা হয়ে গেছে একাধিকবার। এমনকী এই অতিমানবিক কীর্তির স্বাক্ষর বহন করছে ভারতীয়রাও। হয়তো বিশ্বে বড়ো বড়ো স্পোর্টিং ইভেন্টে ভারতীয়দের বড়ো মুখ করে বলার মতো গৌরবগাঁথা নেই, কিন্তু অ্যাডভেঞ্চারাস ইভেন্টে ভারত যে উন্নত দুনিয়ার থেকে খুব একটা পিছিয়ে নেই তার প্রমাণ সত্যব্রত দাস, বুলা চৌধুরীরা। সত্যব্রত ছয় মহাদেশের সব সুউচ্চ পর্বতশৃঙ্গ জয় করা ছাড়াও উত্তর ও দক্ষিণ মেরু জয় করে তিন মেরু জয়ের অংশীদার। বিশ্বে সর্বপ্রথম এই কৃতিত্ব অর্জন করেন ব্রিটিশ কিংবদন্তী ক্রিস বনিংটন। আর বুলা চৌধুরী সপ্তসিন্ধু অর্থাৎ সবকটি মহাসাগরের দুর্লঙ্ঘ্য প্রণালী বা চ্যানেল পারাপার করেছেন। স্বাধীনতার পর এই দুই বঙ্গজ যুবক যুবতীর কীর্তিগৌরবে আলোকিত জাতীয় জীবন।

আর প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলার ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে নাম করতে হয় হকির। স্বাধীনতা প্রাপ্তির দুই দশক আগে থেকে ভারত বিশ্বহকিতে অজেয় ছিল। সেই ধারা বজায় ছিল স্বাধীনতার পর আরো দুই দশক ধরে। প্রত্যেকটি বিশ্ব আসরে অপরাজেয় থেকে যে সুউচ্চ মিনার তৈরি করেছিল ভারতীয় হকি দল তার সঙ্গে তুলনা করা চলে কেবল আমেরিকার বাস্কেটবল টিমের। ড্রিমটিম বলে অভিহিত মার্কিন বাস্কেটবল টিম সব দেশকে মাথা নোয়াতে বাধ্য করেছে। আর দুনিয়াকে হকি খেলা শিখিয়ে, সব বিশ্ব খেতাব করায়ত্ত করে ৮০-র দশক থেকে ভারতের হকি বিশ্বসংসারে অস্তিত্বহীন সত্তা হয়ে বিরাজ করেছে। অবস্থার পরিবর্তন হতে শুরু করেছে সম্প্রতি। ২০১৬, ২০১৮ চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে রানার্স হওয়া যেন তারই ইঙ্গিত। স্বাধীনোত্তর ভারতে সর্বোত্তম ক্রীড়া-শিল্পী অবশ্যই সুপার গ্রান্ডমাস্টার

দাবাড়ু বিশ্বনাথ আনন্দ। ৫টি ফিডে বিশ্ব খেতাব জিতেছেন একাধিকবার। দাবার গ্র্যান্ডস্লাম বলে ধরা হয় যেসব টুর্নামেন্ট সব জায়গায়তেই বিজয় কেতন উড়িয়েছেন 'ভিসি'। ৬টি অস্কার পুরস্কার শোভা পাচ্ছে তার ক্যাবিনেটে। সবচেয়ে বড় স্বীকৃতি তাকে দিয়েছে নাসা। আনন্দের নামে একটি সদ্য আবিষ্কৃত গ্রহাণুর নামকরণ করেছে নাসা। ভারতে এই ব্যাপারে তিনি পথিকৃত। বিশ্বে কতিপয় ব্যক্তিত্বের ভাগ্যে এই বিরল সম্মান জুটেছে। আনন্দের পদাঙ্ক অনুসরণ করে উঠে এসেছে অসংখ্য প্রতিভাবান ভারতীয় দাবাড়ু। যে ভারতে আটের দশকের আগে কোনো গ্র্যান্ডমাস্টার ছিল না সেই দেশে আনন্দের উত্থানের পর পুরুষ মহিলা মিলিয়ে কুড়ির ওপর গ্র্যান্ডমাস্টার। আনন্দের বিশ্ববিজয়ে উদ্দীপ্ত হয়ে অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাচীন ঐতিহ্যশালী হাম্পি রাজবংশের উত্তরাধিকারিণী কোনেরু হাম্পি বিশ্বদাবার খেতাবি লড়াইয়ে একেবারে ফাইনাল পর্যন্ত চলে গিয়েছিলেন। বিশ্ব ক্রমপর্যায়ে একনম্বর র‍্যাঙ্কিংয়ে উঠে এসেছিলেন।

ব্যক্তিগত ইভেন্টে এরকম বহু ক্ষেত্রে ভারতীয়দের উজ্জ্বল পদচিহ্ন পড়েছে বিশ্বক্রীড়াবৃত্তে। যেমন সাইনা নেহাওয়াল, পিভি সিন্ধু, কিদাম্বি শ্রীকান্ত এই পাঁচ ভারতীয় তারকা কোনো না কোনো সময়ে বিশ্ব ক্রমপর্যায়ে শীর্ষস্থান দখল করেছেন। প্রকাশ পাড়ুকোন ও পুলেল্লা গোপীচাঁদ বিশ্ব ব্যাডমিন্টনের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্র্যান্ডস্লাম অল-ইংল্যান্ড খেতাব জয় করেছেন। জিতেছেন আরো অনেক বড় বড় টুর্নামেন্ট। সিন্ধু, সাইনা, শ্রীকান্ত সাম্প্রতিককালে বহু সুপার সিরিজ খেতাব জিতেছেন, বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ফাইনাল খেলেছেন। তাদের পারফরমেন্স ভারতকে আজ বিশ্ব বৃত্তে এক বড় শক্তিতে পরিণত করেছে। বিজয় অমৃতরাজ, রমানাথন কৃষ্ণণ ও তাঁর ছেলে রমেশ কৃষ্ণন টেনিসের দলগত বিশ্বকাপ ডেভিসকাপে তিনবার ফাইনালে নিয়ে গেছেন দেশকে। এছাড়া গ্র্যান্ডস্লাম জিততে না পারলেও বেশ কয়েকটি এটিপি ট্যুর খেতাব জিতেছেন। তবে সবাইকে ছাপিয়ে গেছেন লিয়েন্ডার পেজ ও মহেশ ভূপতি। তারা ডেভিস কাপে ডাবলসে যেমন বিশ্বসেরা সব জুটিকে হারিয়েছেন, তেমনি পেশাদার সার্কিটে গুরুত্বপূর্ণ সব টুর্নামেন্ট জিতেছেন। এর মধ্যে আছে উইমবলডন-সহ ফরাসি ওপেন টুর্নামেন্টও।

ভারতের স্বাধীনতা দিবসের পরপরই ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় বসছে এশিয়াডের আসর। এবছর অস্ট্রেলিয়ার গোল্ড কোস্টে কমনওয়েলথ গেমসে ভারত যে পারফরমেন্স মেলে ধরেছে, তার ভিত্তিতে বলা যায় এশিয়ান গেমসেও ভারত মাথা তুলে দাঁড়াবে। যদিও বেশ কয়েকটি ইভেন্টে এশিয়ান গেমসের মান কমনওয়েলথ গেমসের থেকেও উন্নত। চীন দক্ষিণ কোরিয়ার চ্যালেঞ্জ অস্ট্রেলিয়া ইংল্যান্ডের থেকেও বেশি শক্তি নিয়ে হাজির হবে। তবে ৪৭টি দেশ এবং ৪২টি ইভেন্ট নিয়ে চলা এশিয়াড এবার ভারতের সামনে এক উজ্জ্বল দিকচিহ্ন নিয়ে আসতে চলেছে। নিজের দেশে অনুষ্ঠিত এশিয়াডের সাফল্য ও গরিমাকে এবার স্পর্শ করা এমনকী অতিক্রম করাও অসম্ভব নয়। অন্তত কমনওয়েলথ গেমসের কীর্তিকল্প দেখলে। ■

নিজের তৈরি বাড়ির পাশে সপরিবারে মনোজ।

অন্য রকম

মেয়ের বিয়ের আড়ম্বর কমিয়ে গরিবের মাথার ওপর ছাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ কাবুলিওয়ালা গল্পে মিনির বাবা মেয়ের বিয়েতে বিলিতি আলোয় বাড়ি সাজানোর পরিকল্পনা বাতিল করে সেই টাকা তুলে দিয়েছিলেন রহমতের হাতে। প্রতিবেশীদের কাছে একমাত্র মেয়েকে রেখে রহমত সুদূর কাবুল থেকে কলকাতায় এসেছিলেন। দেশে ফেরার টাকা ছিল না। মিনির বাবার মহানুভবতায় রহমত তার ভাগ্যবিড়ম্বনাকে পিছনে ফেলে ফিরতে পেরেছিলেন মেয়ের কাছে।

পাঠক প্রশ্ন করতে পারেন লেখার শুরুতে এই গৌরচন্দ্রিকা কেন? কারণ আমরা যারা ধরে নিয়েছিলাম, 'মিনির বাবা'রা আর নেই, পণ্যসভ্যতার প্ররোচনায় এবং প্রলোভনে হারিয়ে গেছেন, তারা সাম্প্রতিক একটি খবরে বেশ অবাক হয়ে গেছি। ঘটনাস্থল মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদ। সেখানে মনোজ মুনোট নামের এক ব্যবসায়ী তাঁর একমাত্র মেয়ে শ্রেয়ার বিয়ের খরচ কাটছাঁট করে গৃহহীন মানুষের জন্য নব্বইটি বাড়ি বানিয়ে দিয়েছেন।

ব্যাপারটা অন্যরকম অবশ্যই। আজকাল ধনী ব্যক্তিরা খবরে থাকার জন্য অনেক কিছু করে থাকেন। তবে তাদের সেই 'করা' অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অর্থের বিনিময়ে মিডিয়াকে ব্যবহার করার মধ্যেই ঘোরাফেরা করে। কখনও কখনও সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহারও দেখা যায়। বিশেষ করে সেলেব্রিটিরা বাড়ি রং করানোর মতো এলেবেলে খবরও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি-সহ প্রচার করে পাদপ্রদীপের আলোয় থাকার চেষ্টা করেন। কিন্তু মনোজ মুনোট যে সুযোগসন্ধানীদের দলে পড়েন না, তা বলাই বাহুল্য। কারণ নব্বইটি বাড়ি তৈরি করতে শুধু টাকাই খরচ হয় না, বিস্তর ঝামেলাও পোহাতে হয়। সৌভাগ্য, মনোজ ধনীসুলভ উন্নাসিকতা দেখিয়ে পিছিয়ে যাননি। গেলে এতগুলো মানুষের ঘরে ফেরাই হতো না।

বাড়িগুলি তৈরি করতে মনোজের ১.৫ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। না, সেজন্য তার কোনও আক্ষেপ নেই। অহংকারও না। মানবিক হয়ে ওঠার জন্য কেউ প্রশংসা করলে তিনি কুণ্ঠিত বোধ করেন এবং নীচু গলায় বলেন, 'মেয়ের বিয়েতে এমনিতেই অনেক খরচ হয়। যার যেমন ক্ষমতা খরচ করেও থাকেন। কিন্তু প্রচুর খরচ করে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার থেকে দেশ ও সমাজের জন্য কিছু করা আমি বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি।'

কিন্তু দেশ ও সমাজের জন্য কিছু করার জন্য প্রেরণা প্রয়োজন। এই প্রেরণা কি অন্তর্প্রেরণা? এ প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ, আবার নাও। ছোটবেলা থেকেই মনোজ মানুষের কথা ভাবেন। মানুষের দুঃখকষ্ট তাঁকে নাড়া দেয়। ধনী ব্যবসায়ী হলেও জীবনের সবকিছু অর্থের মাপকাঠিতে বিচার করতে তাঁর মন সায় দেয় না। কিন্তু গরিব মানুষের মাথার ওপর ছাদ বানিয়ে দেবার প্রেরণা তিনি পেয়েছেন বিজেপির তরুণ বিধায়ক প্রশান্ত বামরের কাছ থেকে। মনোজ স্বীকার করেন সেই ঋণ। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলে যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সম্পর্কে তাঁর মুগ্ধতার কথাও। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা তাঁর মতে মোদী সরকারের শ্রেষ্ঠ প্রকল্প।

আরও একটি বিষয়ে মনোজ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি হিন্দুত্ববাদী। জাতীয়তার বোধসম্পন্ন মানুষ। কিন্তু মুসলমান বিরোধী নন। ভারতের জাতীয় এবং আঞ্চলিক মিডিয়ার মনোজকে দেখে শেখা উচিত। মনেপ্রাণে হিন্দু থেকেও মুসলমানকে আশ্রয় দেওয়া যায়। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ কখনওই সাম্প্রদায়িক হবার শিক্ষা দেয় না।

মনোজের তৈরি করে দেওয়া বাড়িতে অনেক মুসলমান পরিবারই আশ্রয় পেয়েছেন। তাদের মধ্যে একজন শাব আলি শেখ। মধ্যবয়েসি মহিলা। লোকের বাড়িতে কাজ করেন। তিনি বলে, 'আগে যেখানে থাকতাম সেখানে জল ছিল না, বিদ্যুৎ ছিল না। সব থেকে বড়ো কথা এটা আমার নিজের বাড়ি। আমাকে আর কোনওদিনই ভাড়া দিতে হবে না।' আর একজন বাড়ির মালিকের নাম মনসুর শেখ। শ্রেয়া আর মনোজের নাম বলা মাত্র তিনি দু'হাত তুলে দু'জনকে আশীর্বাদ করলেন। বললেন, এখানে যাঁরা বাড়ি পেয়েছেন তাঁরা কোনওদিনই শ্রেয়ার বিয়ের কথা ভুলবেন না।

এও যেন রহমতের দেশে ফেরার গল্প। থুড়ি, ঘরে ফেরার গল্প। শুধু আফশোস, আজ আর রবীন্দ্রনাথ নেই। থাকলে দেখতে পেতেন এতদিনে তার কল্পনা সত্যি হয়েছে।

ইনসলভেন্সি রোড ও ব্যাঙ্ক-ঋণখেলাপিরা

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্যাঙ্কের এন পি এ মানে ধার দেওয়া যে টাকা থেকে ব্যাঙ্ক তার প্রাপ্য সুদ হিসেবের মধ্যে অর্থাৎ তার খাতায় নিতে পারে না। এর ফলে ব্যাঙ্কের লোকসান হওয়ার কথা আমরা সকলেই শুনেছি। নির্দিষ্ট সময়ে পাওয়া টাকা বা সুদ ব্যাঙ্কে শোধ না করলে নিয়ম অনুযায়ী ওই অ্যাকাউন্টটি তা সে ব্যক্তিগত , পার্টনারশিপ, প্রাইভেট লিমিটেড বা বড়ো পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি যাই হোক না কেন, তাকে এন পি এ ঘোষণা করা হয়। সারাদেশে এখন লক্ষ লক্ষ দেনাদার চিহ্নিত হয়েছে যাদের কারবার হয়তো তারা চালাচ্ছে, কিন্তু ব্যাঙ্কে ঋণের বকেয়া বাবদ কোনও টাকা দিচ্ছে না।

হাত গুটিয়ে বসে না থেকে নিশ্চয় চিরাচরিত আদালতে গিয়ে Money suit-এর মাধ্যমে টাকা আদায় করতে যে অনাদিকাল লেগে যায় একথা ব্যাঙ্ক ও দেনদার উভয়েই জানে। এই সুযোগ নিয়ে অনেকেই ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি হওয়ার সুবিধে নেয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে যথেষ্ট ফিক্স অ্যাসেট, জমি জমা মেশিনপত্র নিয়েও কোনও উৎপাদক সংস্থা বা অন্য ধরনের ট্রেডিং বিজনেসে জড়িত সংস্থা নানা কারণে তাদের ব্যবসা ঠিকভাবে পরিচালিত না করতে পেরে ব্যর্থ হয়। এই রকমের বকেয়া টাকা না পাওয়ার ধাক্কা সামলাতে না পেরে পরিণতিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় মূলত সরকারি ব্যাঙ্কগুলি। এখন বেসরকারি ব্যাঙ্কও এর থেকে রেহাই পাচ্ছে না। তাদের টাকার অঙ্ক হয়তো কম যেহেতু বিস্তার কম।

আমরা আগে খুব শুনতাম অমুক সর্বস্বান্ত হয়েছে, ওকে দেউলে ঘোষনা করা হয়েছে। আদালতে রায় বেরোয় দেউলে হওয়ার। দেশের অর্থনৈতিক চালিকাশক্তি ব্যাঙ্কগুলিকেও এই দেউলে হয়ে যাওয়ার রাস্তায় আটকাতে কেন্দ্র সরকার ২০১৬ সালে Insolvency Bankruptcy Code আইন সংসদে পাশ করায়। বলা দরকার ২০১৮ সালের অর্থবর্ষে ব্যাঙ্কগুলির সামগ্রিক এনপিও ভয়াবহভাবে ১০.২৫ লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। সরকার এর আগে এই সংক্রান্ত ক্ষতি কিছুটা পুষিয়ে দিতে বিভিন্ন ব্যাঙ্কে তাদের ব্যবসার বহর অনুযায়ী ২ লক্ষ ১১ হাজার কোটি টাকা ধাপে ধাপে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু পুঞ্জীভূত ও ক্রমবর্ধমান এন পি এ-এর পাহাড় সরাতে তা নিতান্তই নস্যি। গোটা বিষয়ের বিপদ সমেত পার্যালোচনা করেই সরকার আই বি সি নিয়ে আসে। এক্ষেত্রে Insolvency Bankruptcy প্রায় সমার্থক— এটাই আমরা মনে করলেও দুটির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তার অর্থনৈতিক পাওনা মেটাতে না পারলে insolvent বা দেউলে আখ্যা পায়। কিন্তু এই অবস্থাকে সরকারি ভাবে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে Bankruptcy Proceeding-এর আইনি পন্থা গ্রহণ করতে হয়। এই ক্ষেত্রে সরকার তাকে সব রকমের সাহায্য করে। এবার এই বিপি-এর দুটি ভাগ রয়েছে— একটি Reorganisation or Reconstruction of Bussiness ও সরাসরি আই বি সি আইনে winding up বা কোম্পানি গুটিয়ে নেওয়া। প্রথমটির ক্ষেত্রে সরকারের তরফে পেশাদারি Chartered Accountant, আইনি বিশারদ ও অন্যান্য অনেক এই বিষয়ে পারদর্শীদের এই ধরনের দেউলে সংস্থাগুলিতে পাঠানো হয়। তারা সংস্থার দুর্বলতাগুলিকে চিহ্নিত করে। কোন জায়গায় গাফলতি ছিল সেগুলো দেখে তা থেকে বেরোবার রাস্তা বাতলায়। এই নতুন তৈরি হওয়া অর্থনৈতিক সংকটের মোকাবিলায় সরকার ইন্ডিয়ান ইনসলভেন্সি বোর্ড তৈরি করেছে। তারাই সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলিতে উল্লখিত পেশাদারদের নিযুক্ত করে। বিভিন্ন ব্যাঙ্কের সঙ্গে আলোচনা বা সমঝোতা করার মতো পরিস্থিতি থাকলে সেই ত্রিপাক্ষিক (মালিক, আই বি বি প্রতিনিধি ব্যাঙ্ক) আলোচনার মাধ্যমে পরিস্থিতিতে ত্রুটি বিচ্যুতি সংশোধনের ব্যবস্থা করে। কোম্পানির উদ্বৃত্ত জমি যা কাজে লাগছে না, সরকারের মধ্যস্থতায় তা উপযুক্ত ক্রেতার হাতে তুলে দিয়ে কোম্পানিতে নতুন টাকার প্রবাহ বাড়ায়। বহু ক্ষেত্রে কর্মীদের চাকরি বিপন্ন না করে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠিত business house-কে কোম্পানির মালিকানা হস্তান্তর করে। মনে রাখতে হবে, এই আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে সমস্ত পূর্বতন পরিচালন কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ যাদের গাফিলতিতে সংস্থার এই দেউলিয়া পরিণতি হয়েছে, তাদের নাক

২০১৮ ত্রৈমাসিকে ব্যাঙ্ক অব বরোদা গত ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৪ গুণ বেশি লাভ করে ৫০০ কোটি টাকা ছুঁয়েছে। এস বি আই পি এল বি এবং অন্যান্য বড় ব্যাঙ্কগুলিও এন পি এ পুনরুদ্ধার করছে ও এই অর্থনৈতিক বর্ষে চমকপ্রদ রিকোভারি করবে বলেই খবর। এই পুনরুদ্ধার পর্বে আই বি পেশাদারদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করাই সরকারের বড় দায়িত্ব।

গলাতে দেওয়া হয় না। আবার যারা সহযোগিতা করে সংস্থা চালাতে চায় তাদের ক্ষেত্রে অন্য মানদণ্ডে বিচার করা হয়।

বাস্তবে দেউলে ঘোষিত কোম্পানি যারা ব্যাঙ্করাপসি প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়েছেন, সেখানে আই বি সি-এর তরফে যে সমস্ত পেশাদাররা পুনরুদ্ধারের কাজে যাচ্ছেন তাদের (১) কোম্পানির মালিক বা পরিচালন পর্ষদের অসহযোগিতার মুখোমুখি হতে হয় (যেহেতু তার ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে)। (২) কোম্পানির অন্য পাওনাদাররা বকেয়া টাকার জন্য উত্তেজিত হয়ে পড়েন, (৩) সংস্থার কর্মীরা যাদের মনে স্বাভাবিক ভয় থাকে কোম্পানি উঠিয়ে দিলে তাদের চাকরি থাকবে না, কেননা আই বি সি-তে reorganisation-এর সঙ্গে winding up বা সবশেষে বন্ধ করে দেওয়ার সংস্থার যেহেতু আছে।

এই ত্রিমুখী আক্রমণের মুখে পড়ে তাদের কাজটাই ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। সম্প্রতি এমন একটি রোমহর্ষক ঘটনা খবরে এসেছে। দেবেন্দ্র জৈন নামে এক Chartered Accountant একজন Bankruptcy বিশারদ। আই বি বি-এর প্রতিনিধি হিসেবে তিনি মুম্বাইয়ের একটি দেউলে সংস্থার পুনরুদ্ধারে কাজ করাকালীন প্রকাশ্য দিবালোকে জনবহুল রাস্তা থেকে অপহৃত হয়ে যান। একদল কোম্পানির পাওনাদার কোম্পানির গেটে তাঁকে ঘিরে তাঁদের টাকা কবে পাওয়া যাবে বলে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। এর মধ্যেই একটি গাড়ি এসে তাঁকে জবরদস্তি তুলে নিয়ে চলে যায়। ভাগ্যভালো ২৪ ঘণ্টা পরে পুলিশ খোঁজ পেয়ে ব্যবস্থা নেয়।

আজকে এশিয়ার তৃতীয় ও বিশ্বের ষষ্ঠতম অর্থনীতিতে ২১০ বিলিয়ন ডলার ব্যাঙ্কের অসুস্থ বা বহু ক্ষেত্রে দেউলে হয়ে যাওয়া সম্পদের বিলি ব্যবস্থা করে এই জৈনরাই দেশের অর্থনীতিকে শুদ্ধিকরণের পথে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। গোটা দেশের অর্থনীতিকে অনুৎপাদক সম্পদ আজ যখন প্রায় অবরুদ্ধ করে ফেলেছে তখন আই বি বি-এর পেশাদার Resolution professional-রা কোম্পানিতে বিপুল ঝুঁকি নিয়ে সঠিক অর্থে দেশের অর্থনৈতিক জঞ্জাল সাফ করছেন। এর প্রত্যক্ষ ফলও মিলেছে।

আগে চলা ত্রিমুখী চাপের কাছে নিজেদের নিরাপত্তার জন্য এঁদের অনেককেই ব্যক্তিগত আগ্নেয়াস্ত্র-সহ দেহরক্ষীর ব্যবস্থা করেছে তার মধ্যে মানসিক আতঙ্কজনিত Trauma এবং অপঘাত মৃত্যুও রয়েছে।

আর বি আই-এর খবর অনুযায়ী ভবিষ্যতে এই বিশেষ পেশাদারদের কাজের পরিমাণ বিপুল বৃদ্ধি পাবে। কেননা দেশের দূষিত ঋণের অঙ্ক (সামগ্রিক ঋণের অনুপাতে) বিশ্বের ১০টি বড় অর্থনীতির মধ্যে কেবলমাত্র ইতালির (১৪.৪ শতাংশ) পরেই ১১.৬ শতাংশে অবস্থান করছে। যেখানে প্রতিবেশী চীনের পরিমাণ মাত্র ১.৭ শতাংশ।

দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে ব্যাঙ্কের তরফে সমূহ আসন্ন বিপদের আগাম অনুমান করে সরকার তার প্রতিষেধক হিসেবে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় এই ব্যবস্থা নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ২৭০ দিনে বড় সড় কাজ দেখাবার সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন। আজ ভারতীয় ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা তথা অর্থনীতির পুনর্বাসনের অনেকটা দায়িত্বই এই আই বি পেশাদারদের হাতে। প্রসঙ্গত ৩০ জুন ২০১৮ ত্রৈমাসিকে ব্যাঙ্ক অব বরোদা গত ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৪ গুণ বেশি লাভ করে ৫০০ কোটি টাকা ছুঁয়েছে। এস বি আই পি এল বি এবং অন্যান্য বড় ব্যাঙ্কগুলিও এন পি এ পুনরুদ্ধার করছে ও এই অর্থনৈতিক বর্ষে চমকপ্রদ রিকোভারি করবে বলেই খবর। এই পুনরুদ্ধার পর্বে আই বি পেশাদারদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করাই সরকারের বড় দায়িত্ব।

(লেখক অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ক আধিকারিক)

জাতীয়তাবাদী
বাংলা সংবাদ
সাপ্তাহিক
স্বস্তিকা
পড়ুন ও পড়ান
প্রতি কপি ১০.০০ টাকা
বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০ টাকা

পরলোকে কিংবদন্তি অস্থিরোগ বিশেষজ্ঞ
ডাঃ শৈলেন্দ্র ভট্টাচার্য

ভারত তথা দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় অস্থিরোগ বিশেষজ্ঞরূপে যাঁর মান্যতা সর্বাধিক, পশ্চিমবঙ্গের গর্ব সেই কিংবদন্তি চিকিৎসক ডাঃ শৈলেন্দ্র ভট্টাচার্যের প্রয়াণ আমাদের সকলকে শোকাহত করেছে। গত ১৮ জুলাই, ২০১৮, বুধবার, রাত ৮টায় নিজেরই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গের অস্থিরোগ চিকিৎসার সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 'ভট্টাচার্য অর্থপেডিক ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড রিলেটেড রিসার্চ সেন্টার'-এর নিজস্ব কক্ষে পরিজনপরিবৃত অবস্থায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। বার্ধক্যের বিরুদ্ধে তাঁর বিরামহীন যুদ্ধের সেখানেই ইতি। মাত্র মাস চারেক আগে তাঁর বিশেষ প্রীতিভাজন প্রবীণ কথাশিল্পী শেখর সেনগুপ্তর দুর্ঘটনাহেতু ডান কাঁধ চূর্ণ হওয়ায় এই বয়সেও তিনি তাঁর দক্ষ ছাত্র-চিকিৎসকদের সবিস্তারে নির্দেশ দেন, কীভাবে অপারেশন করে লেখককে আবার তাঁর লেখার চেয়ার-টেবিলে এনে বসানো যায়। শায়িত অবস্থায় থেকেও তিনি এইভাবে অনেক বিশিষ্টজনের যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করতেন। বিপুল খ্যাতি, বিত্ত এবং মর্যাদা সত্ত্বেও তাঁর সহজিয়া, শোভিত আচরণ ও মেজাজ, আমিত্বশূন্য আন্তরিকতা ছিল একান্তই শিক্ষণীয়।

এক জীবনে অর্জিত তাঁর বিদ্যা এবং কৃতিত্বকে প্রথাগত চৌহদ্দির মধ্যে আটকে রাখা যায় না। ঠাকুর ওঙ্কারনাথ তাঁরই অস্ত্রোপচারগুণে হাঁটাচলায় পূর্বাপেক্ষা স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে পান। মাদার টেরেসার চূর্ণ কোমরকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনেন তিনি। ইন্দিরা গান্ধীর ব্যক্তিগত অনুরোধে সাড়া দিয়ে তিনি নেলী সেনগুপ্তকে পুনরায় দুই পায়ের ওপর দাঁড় করিয়ে দেন। লেককালীবাড়ির প্রতিষ্ঠাতা তন্ত্রাচার্য শ্রীশ্রী হরিপদচক্রবর্তী পথদুর্ঘটনাহেতু মারাত্মকভাবে জখম হন। ডাঃ শৈলেন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁকেও সুস্থ করে তোলার পর সেই অনন্যসাধক হিমালয়ের দিকে যাত্রা শুরু করেন। এরকম সংখ্যাতীত দৃষ্টান্ত রয়েছে। আরও বহু সেলিব্রিটি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। কেবল পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতের নয়, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের এই প্রিয় ছাত্রটির চিকিৎসা ব্যাপ্তিতে উপকৃত হয়েছে যুগপৎ ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও। মেধার প্রখরতায় তিনি ইংল্যান্ড থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি পেয়েছেন।

অনেক বছর চিকিৎসকের ভূমিকা গৌরবের সঙ্গে পালন করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। বিশ্বের বহুদেশে চিকিৎসকদের সমাবেশে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। পণ্ডিচেরী উড়ে গেছেন অনেকবার সেখানে একটার পর একটা অপারেশন করে আসতেন। অথচ এমন একজন কৃতী চিকিৎসকের কপালে কোনও সরকারি তকমা জোটেনি। এর কারণ হয়তো এই যে, ডাঃ শৈলেন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তা নিয়ে কোনও রাজনৈতিক দলের শামিল হননি। তিনি 'স্বস্তিকা'র গ্রাহক হয়েছিলেন এবং 'স্বস্তিকা'য় প্রকাশিত নিবন্ধগুলি নিয়ে আলোচনাও করতেন।

শিল্প-সাহিত্য-শিক্ষাজগতে যাঁরা বিশিষ্ট, এরকম মানুষদের সঙ্গেই তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল বেশি। সেই তালিকায় রয়েছেন সংবাদপত্র জগতের অনন্য নক্ষত্র বরুণ সেনগুপ্ত, বলিষ্ঠ ও বিতর্কিত উপন্যাসিক সমরেশ বসু, বিশিষ্ট কথাশিল্পী বিমল কর, শিক্ষাবিদ-রাজনৈতিক নেতা হরিপদ ভারতী, নিভৃতচারী লেখক শেখর সেনগুপ্ত, কিংবদন্তি নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর, নারায়ণপুর-রাজারহাটের রাজনৈতিক নেতা ও সমাজসেবী গৌতম সেনগুপ্ত, বিধাননগরের ডেপুটি মেয়র তাপস চ্যাটার্জি, স্থানীয় জননেতা এবং সাহিত্যসেবী শিবপ্রসাদ কুণ্ডু, রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, প্রখ্যাত দন্তচিকিৎসক ডাঃ অনির্বাণ সেনগুপ্ত, খ্যাতনামা সাংবাদিক বাহারউদ্দিন, বিশিষ্ট পুস্তক প্রকাশক পিনাকী দত্ত প্রমুখ। ডাঃ ভট্টাচার্য প্রতি শনি ও রবিবার দিন কাটাতেন শান্তিনিকেতনে— যেখানে তাঁর দুটো বাংলো রয়েছে। প্রায় সাড়ে ছয় দশক ধরে প্রান্তজন থেকে আরম্ভ করে সমাজের সর্বোচ্চস্তরের মানুষদের কাছে তিনি ছিলেন সাক্ষাৎ বরাভয়মূর্তি। নারায়ণপুরে অর্থোপেডিকস হাসপাতাল তৈরি করে তিনি সবিনয়ে এই কথাগুলি প্রায়ই বলতেন, 'আমি এই দুনিয়ায় এসেছি চিকিৎসা করতে। তাতে আমি কতটা যোগ্যতার পরিচয় দিতে পেরেছি, তা জরিপের ভার থাকল নিরবধি কালের হাতে।'

পরিবারে রেখে গেলেন পুত্র ইন্দ্রজিৎ ভট্টাচার্য, কন্যা শর্মিষ্ঠা চৌধুরী, পুত্রবধূ কল্যাণী ভট্টাচার্য। জামাতা এবং নাতি-নাতনিদের।

আর আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের ডাক্তারবাবু আবার ঠিক ফিরে আসবেন নবরূপে। ■

মমতার আচরণ মুখ্যমন্ত্রীসুলভ নয় : সর্বানন্দ সোনওয়াল

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ জাতীয় নাগরিকপঞ্জি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে রাজনীতি শুরু করেছেন, তার তীব্র বিরোধিতা করেছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনওয়াল। অসমের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'নাগরিকপঞ্জি সম্বন্ধে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছেন এবং বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন।' অসমে খসড়া নাগরিক পঞ্জি প্রকাশ হওয়ার পর থেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর বিরোধিতা করছেন। মমতা অভিযোগ করেছেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই বিজেপি সরকার এই নাগরিকপঞ্জি প্রণয়ন করেছে। মমতার বক্তব্য, এর মাধ্যমে বিজেপি বিভাজনের রাজনীতি করতে চাইছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর এইসব বক্তব্যেরই প্রতিবাদ করেছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী।

সর্বানন্দ সোনওয়াল বলেছেন, 'তৃণমূল কংগ্রেস নাগরিকপঞ্জি নিয়ে মিথ্যা প্রচার করছে। সম্পূর্ণ ভুল তথ্য দিয়ে সংসদের গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্ম ভণ্ডুল করছে। খসড়া নাগরিকপঞ্জি প্রকাশের পর অসম সম্পূর্ণ শান্ত। আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিঘ্নিত হওয়ার একটিও ঘটনা ঘটেনি। সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার সঙ্গে এবং সুষ্ঠুভাবে নাগরিক পঞ্জিকরণের কাজ চলছে।' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনা করে সোনওয়াল আরও বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীই বিভাজনের রাজনীতি করছেন। নিজের রাজ্যের সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্কের দিকে তাকিয়ে তিনিই বিদ্বেষ ছড়াচ্ছেন। তিনি যা করছেন, তা মুখ্যমন্ত্রী সুলভ আচরণ নয়।'

নাগরিক পঞ্জিকরণ প্রসঙ্গে কংগ্রেসকেও এক হাত নিয়েছেন সোনওয়াল। নাগরিক পঞ্জিকরণের কৃতিত্ব যেভাবে কংগ্রেস দাবি করছে তাকে নস্যাৎ করে সোনওয়াল বলেছেন '২০১০ সালে নাগরিক পঞ্জিকরণের একটি পাইলট প্রোজেক্টও কংগ্রেস সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারেনি। তারা আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির দোহাই

দিয়েছিল। কিন্তু আমরা সুষ্ঠুভাবে খসড়া নাগরিকপঞ্জি প্রকাশ করেছি।'

এদিকে, নাগরিকপঞ্জি প্রকাশের পর কোনো কোনো মহল অসমে উত্তেজনা সৃষ্টি করতে চাইছে বলে অসম পুলিশের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে। অসম পুলিশ বলেছে, সম্প্রতি হোয়াটস অ্যাপে একটি ভিডিও ছড়িয়ে দিয়ে প্রচার করা হচ্ছে যে, নাগরিকপঞ্জি প্রকাশের পর অসমে পুলিশের সঙ্গে জনতার সংঘর্ষ বেঁধেছে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হলো, নাগরিকপঞ্জি প্রকাশের পর অসমে একটিও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেনি। আর ছবিটি দেখেই বোঝা যাচ্ছে, অন্য কোনো রাজ্যে জনতা-পুলিশ সংঘর্ষের ঘটনাকে এক্ষেত্রে অসমের ঘটনা বলে ভুল বোঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। অসম পুলিশের পক্ষ থেকে সমস্ত হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপকে এই ভিডিও নিষিদ্ধ করতে বলা হয়েছে। অসম পুলিশের এক আধিকারিক বলেছেন, অসমের বাসিন্দা যে কোনো মানুষই ভিডিওটি দেখলে বুঝতে পারবেন— ঘটনাটি আদৌ অসমের নয়। অসম পুলিশ সন্দেহ করছে বাইরের কোনো রাজ্য থেকে চক্রান্ত করেই এই ভিডিওটি ছড়ানো হয়েছে। যারা জাতীয় নাগরিকপঞ্জির বিরোধিতা করছে, তারাই অশান্তি সৃষ্টির জন্য এই ধরনের ভিডিও ছড়াচ্ছে বলে অসম পুলিশের অভিযোগ। ভিডিওটিতে দেখানো হয়েছে, মুসলমানদের একটি গোষ্ঠী পুলিশকে লক্ষ্য করে ইঁট-পাথর ছুঁড়ছে। অসমে নাগরিকপঞ্জিকরণের মুখ্য অধিকর্তা প্রতীক হাজেলা বলেছেন, খসড়া তালিকা থেকে যাদের নাম বাদ পড়েছে, তাদের নাম কী কারণে বাদ পড়ল তা ১০ আগস্ট তারিখ থেকে জানানো হতে থাকবে।

এদিকে অসমে খসড়া নাগরিকপঞ্জি প্রকাশ হওয়ার পর মেঘালয় সরকার ঘোষণা করেছে— অসম-মেঘালয় সীমান্তে তারা সাতটি 'চেকপোস্ট বসিয়েছে। এই চেকপোস্টগুলি বসানোর উদ্দেশ্যই হলো, অসম থেকে কোনো বেআইনি অনুপ্রবেশকারী যাতে মেঘালয়ে ঢুকে না পরে তা দেখা। মেঘালয়ের পুলিশ সুপার দেবাংশু সাংমা বলেছেন, চেকপোস্ট পেরিয়ে কেউ মেঘালয়ে ঢুকতে চাইলেই তাকে ভারতীয় নাগরিকত্বের পক্ষে উপযুক্ত প্রমাণপত্র দাখিল করতে হবে।' পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, জয়ন্তীয়া পাহাড়, পশ্চিম খাসি পাহাড়, গারো পাহাড় এবং রি ভোই অঞ্চলে এরকম আরো চেকপোস্ট বসানো হবে। এরই মধ্যে অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনওয়াল টেলিফোনে মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমার সঙ্গে কথা বলেছেন। সাংমাকে অসমের মুখ্যমন্ত্রী অনুরোধ জানিয়েছেন, অসম এবং মেঘালয়ের ভিতরে পণ্য এবং যাত্রীবাহী যান চলাচলে যেন কোনো অসুবিধা না হয় তা দেখতে। অসমের প্রকৃত বাসিন্দাদের কিছু অসুবিধার মধ্যে পড়তে হচ্ছে বলে ইতিমধ্যেই তিনি বিষয়টি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংহের নজরে এনেছেন বলেও সাংমাকে জানিয়েছেন সোনওয়াল। মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী সাংমা সোনওয়ালকে আশ্বস্ত করেছেন, পণ্য এবং যাত্রীবাহী যান চলাচলে যাতে কোনো অসুবিধা না হয়— তা তিনি দেখবেন।

নাগরিকপঞ্জিতে খুশি বিশ্বভারতীতে পড়তে আসা অসমের ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ জাতীয় নাগরিকপঞ্জি নিয়ে রাজ্যজুড়ে বিতর্কের মাঝে উলট পুরাণ এই পশ্চিমবঙ্গের শান্তিনিকেতনে। রাজ্য সরকার যখন এই নিয়ে প্রকাশ্যে রাজনীতি করছে, তখন বিশ্বভারতীতে আসা অসমের বাসিন্দা বাঙালি-অসমীয়-মুসলমান ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা এন আর সি-কে স্বাগত জানাচ্ছে।

অসমে খসড়া রাষ্ট্রীয় নাগরিক পঞ্জি প্রকাশের পর খুশিতে মাতলেন কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বভারতীতে অসমীয় পড়ুয়া ও অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা। তাদের মতে দীর্ঘ দিনের একটি আন্দোলন সফলতা লাভ করেছে। প্রকৃত অসমবাসী এবার বেশি সুযোগ-সুবিধা পাবেন বলে মনে করছেন তাঁরা। একই সঙ্গে বাঙালিদের তাড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে তাঁরা মনে করেন।

উল্লেখ্য, ১৯৫১ সালের পর ভারতবর্ষে নাগরিকপঞ্জি হয়নি। অসমে অনুপ্রবেশের অভিযোগ দীর্ঘদিনের। এই নিয়ে বহু আন্দোলন চলছিল অসম রাজ্যে। সেই মতো ২০০৯ সালের ৯ নভেম্বর ভারত সরকার, অসম সরকার ও অসম ছাত্র সংস্থা একটি বৈঠক করে রাষ্ট্রীয় নাগরিকপঞ্জির বিষয়টি ঠিক করে। ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চের পরে প্রবেশকারীদের অনুপ্রবেশকারী হিসাবে ধরা হবে। সেই মতো ৩ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষ নাম তালিকাভুক্ত করার আবেদন করে। দেশের শীর্ষ আদালতের নির্দেশে অসমে প্রকাশিত হয় খসড়া রাষ্ট্রীয় নাগরিকপঞ্জি (এন আর সি)। এই তালিকা থেকে প্রায় ৪০ লক্ষ মানুষের নাম বাদ পড়ে। এই নিয়ে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি সরগরম।

বিশ্বভারতীর অসমীয় ছাত্র-ছাত্রী এবং অধ্যাপকদের মতে, এটি একটি বড় পদক্ষেপ। তাদের মতে বর্তমানে অসম সরকারের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে অযথা আতঙ্ক ছড়ানো হচ্ছে। কারণ স্বাধীনতার অনেক আগে থেকেই অসমে বহু বাঙালি, মাড়োয়ারি-সহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করেন। তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হবে বলে অযথা অপপ্রচার চালাচ্ছেন পশ্চিম্বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অসমীয়দের সঙ্গে তাদেরও সে রাজ্যে থাকার সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে। তবে দীর্ঘ তিন দশক ধরে যে এক নাগাড়ে অসম জুড়ে অনুপ্রবেশ ঘটেছে তাতে অসমীয়রা নিজে রাজ্যে ভূমিহীন হবার আশঙ্কায় ভুগছেন। এমনকী কাজিরাঙা অভয়ারণ্যের বহু জায়গায় রাতারাতি দখল করে বাংলাদেশি মুসলমানরা গ্রাম তৈরি করে ফেলছে। বহু সরকারি জায়গা দখল করে তারা বসে পড়ছে।

বিশ্বভারতীর অসমীয় বিভাগের বিভাগীয় প্রধান সঙ্গীতা সাইকিয়া বলেন, ''বিদেশি অনুপ্রবেশকারীদের অনুপ্রবেশ সমস্যায় আমরা জর্জরিত। উচ্চন্যায়ালয়ের নির্দেশে এই কাজ হচ্ছে। দীর্ঘদিনের একটা প্রচেষ্টা রূপ পেল। আমরা এতে খুবই খুশি। অনুপ্রবেশকারীদের জন্য অসমের সংস্কৃতি, অর্থনীতির অনেক ক্ষতি হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে এই বিষয়ে অসমে আন্দোলন চলছিল। তবে এন আর সি-র নামে অসম থেকে বাঙালি তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে যে প্রচার চলছে তা ভিত্তিহীন। অযথা আতঙ্ক ছড়ানো হচ্ছে। স্বাধীনতার বহু আগে থেকেই অসমে বহু বাঙালি বাস করে। তারা আমাদের রাজ্যের বাসিন্দা।''

প্রায় একই কথা বলেন বিশ্বভারতীর আরেক অসমীয় অধ্যাপক শান্তিপ্রসাদ সিংহ। তিনি বলেন, ''আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল। তা পূরণ হতে চলেছে। সারা অসমবাসী একে স্বাগত জানাবে নিশ্চয়ই।''

অসমের বাসিন্দা বিশ্বভারতীর গবেষক ছাত্র আজিজুর রহমান সরকার নিজে এন আর সি-র কাজ চলাকালীন হাত লাগিয়ে সেই কাজ করেছেন। তিনি নিজে সরকার নিযুক্ত হয়ে ফিল্ড ভেরিফিকেশনের কাজ করেছেন। তিনি বলেন, ''আমার মনে হয় এন আর সি হলে বাংলাদেশিদের নিয়ে যে রাজনীতি হচ্ছে তা বন্ধ হয়ে যাবে। এটা হওয়াটা জরুরি ছিল। একটা সমস্যা এতদিন ধরে চলছে। তার সমাধান হবে। বাংলাভাষী হলেই বাংলাদেশি বলে যে অপবাদ তা আর থাকবে না। আর এন আর সি নিয়ে গেল গেল রব তোলা হচ্ছে তা মোটেই ঠিক নয়।''

বিশ্বভারতীর পড়ুয়া অসমের বাসিন্দা বাঙালি ছাত্রী সাগরিকা চক্রবর্তী বলেন, ''আমরা এই নাগরিকপঞ্জির জন্য খুব খুশি। আমরা অনেক বেশি সুযোগ-সুবিধা পাব। আগে আমরা বঞ্চিত হতাম অনুপ্রবেশকারীদের জন্য। তবে অসমে যেন কোনও গণ্ডগোল না হয়। আমার পরিবার সেখানে আছে। বাঙালিদের তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে এই প্রচার ঠিক নয়।''

অসমের বাসিন্দা বিশ্বভারতীর অসমীয় ছাত্রী চিন্ময়ী দাস এন আর সি-কে স্বাগত জানিয়ে বললেন, এন আর সির জন্য জানতে পারলাম আমার রাজ্যে কতজন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী রয়েছে। সীমান্ত লাগোয়া সব রাজ্যে এন আর সি হওয়া উচিত। সব জায়গায় এটা হলে জানা যাবে কত জন ভারতীয় এবং কত জন অনুপ্রবেশকারী রয়েছে এই সব রাজ্যে। এর সঙ্গে আমাদের দেশের নিরাপত্তাও জড়িয়ে আছে।

অনুপ্রবেশকারীদের ভারত থেকে যেতেই হবে : অমিত শাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ জাতীয় নাগরিকপঞ্জি নিয়ে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ আরও একবার তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করলেন। সম্প্রতি তিনি বলেন, বাংলাদেশ থেকে যারা অবৈধভাবে ভারতে অনুপ্রবেশ করেছেন তাদের নিজের দেশে ফিরে যেতেই

হবে। রাজস্থানের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক জনসভায় তিনি আরও বলেন, 'কংগ্রেস ভোটব্যাঙ্ক বাঁচাবার চেষ্টা করছে। রাজস্থানে এলে রাহুলবাবাকে জিজ্ঞাসা করবেন, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের কি তাদের নিজের দেশে ফেরত পাঠানো উচিত নয়? জাতীয় নাগরিকপঞ্জির নবীকরণ করা কি অনুচিত? আর, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের কি এদেশে থাকতে দেওয়া উচিত?' অমিতের সহাস্য রসিকতায় হাততালিতে ফেটে পড়ে রাজস্থানের কাঁকরোলির জনতা। তিনি জানান, অসমের বিজেপি সরকার ইতিমধ্যেই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীর চিহ্নিত করার কাজ শুরু করেছে। অমিতের দাবি, 'বিজেপি বা মোদী সরকার ভোটব্যাঙ্কের কথা মাথায় রেখে কোনও কাজ করে না। আমাদের কাছে সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ রয়েছে, আমরা তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করব।' তিনি আরও বলেন, কংগ্রেস নেতারা রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী বসুন্ধরা রাজে সিন্ধিয়া সম্বন্ধে ৪০টি প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর কথায়, 'রাহুলবাবা জানতে চেয়েছেন আমরা এখানে (রাজস্থানে) গত চারবছরে কী করেছি। কিন্তু ভারতের আমজনতা জানতে চায় আপনারা চার প্রজন্ম ধরে এই দেশের জন্য কী করেছেন?' বিজেপি ভারতের জনজাতি আইনকে দুর্বল করে দিচ্ছে বলে কংগ্রেস যে অভিযোগ করেছে, সেই প্রসঙ্গে অমিত শাহ বলেন, 'সুপ্রিম কোর্ট যেরকম নির্দেশ দিয়েছে আমরা ঠিক সেইমতো কাজ করছি। জনজাতি আইনকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে মোদী সরকার বদ্ধপরিকর।'

হিন্দু যুবককে সৌদি আরবে পাচার

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বাংলাদেশের মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর থানার হিন্দু যুবক দীপক হালদারকে সৌদি আরবে বিক্রি করে দিয়েছে মহম্মদ মফিজ, মহম্মদ আফসু মিঞা এবং মহম্মদ আতিয়ার রহমান নামের তিন ব্যক্তি। সৌদি আরবে চাকরির লোভ দেখিয়ে সাত লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার পর দীপককে জাল ভিসা দেয় অভিযুক্তরা। এখন দীপক সৌদি আরবের কোথায় আছেন জানা খুব মুশকিল। সম্প্রতি দীপকের বাবা প্রেমচান হালদার বাংলাদেশ মাইনরিটি ওয়াচের (বিডিএমডবলিউ) কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করে দীপককে সৌদি আরব থেকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার অনুরোধ জানান। স্থানীয় এসপি এবং সিংগাই থানার ওসির সহযোগিতায় এখনও পর্যন্ত একজন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে। তার বিরুদ্ধে মানব পাচার আইনের ৭/৮ ধারায় মামলা দায়ের করেছেন প্রেমচান হালদার। তিনি বলেন, 'এটা খুবই দুঃখের বিষয় মানবপাচারকারীরা দু'জন মুসলমানকে সঠিক ভিসা দিলেও আমার ছেলেকে সৌদি আরবে মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য করেছে।'

পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় জংশন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ উত্তর প্রদেশের মুঘলসরাই জংশনের নাম বদলে গেল। নতুন নাম পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় জংশন। সম্প্রতি বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ নতুন স্টেশনের উদ্‌বোধন করেন। উপস্থিত ছিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী

আদিত্যনাথ, কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল এবং রেল মন্ত্রকের ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী মনোজ সিনহা। এদিন সম্পূর্ণ মহিলাদের দ্বারা চালিত একটি মালগাড়িরও উদ্‌বোধন করা হয়। উল্লেখ্য, গত বছর উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ মুঘলসরাই স্টেশনের নাম পরিবর্তন করে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের নামে রাখার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করেছিলেন। ১৯৬৮ সালে মুঘলসরাই স্টেশনের কাছেই পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল। তাঁরই স্মৃতিতে রাখা হলো স্টেশনের নাম। এবং সেই সঙ্গে মুছে গেল বিদেশি অনুপ্রবেশকারীদের প্রতি দাসত্বের একটি স্মারক।

আমাদের মনের বন্ধু শ্রীরামকৃষ্ণ

পুস্তক প্রসঙ্গ

বিজয় আঢ্য

আমরা সাধারণ সংসারী মানুষরা জীবনে চলার পথে নানা বাধাবিঘ্ন সমস্যার সম্মুখীন হই। স্ত্রী-পুত্র-পরিজন বন্ধুবান্ধব প্রতিবেশী মানুষজনকে নিয়ে আমাদের যে সংসার, সেখানে মতান্তর তো আছেই, মনান্তর বা মনোমালিন্যও আছে। আর এরই ফলে আমরা সবাই কমবেশি অশান্তি, ক্রোধ, দুঃখ ও দুশ্চিন্তার শিকার। অথচ যাদের নিয়ে এই সংসার, যেমন মা-বাবা, স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যার প্রতি আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের একটা দায় রয়েছে। এছাড়াও সামাজিক মানুষ হিসেবে এবং কর্মসূত্রেও আমাদের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করতে হয়। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও এসব সব সময় সুষ্ঠু ভাবে করা যায় না। কেননা বেশিরভাগ সময়ই আমরা মনের ক্রীড়নক। নানাবিধ চাওয়া-পাওয়ার জালে বন্দি। দ্বিতীয়ত, সংসারে স্বার্থপর লোকের সংখ্যা কম নয়। 'এক পয়সার সন্দেশ দোকান থেকে আনতে দিলে চুষে চুষে এনে দেয়' (কথামৃত)। আমাদের ভারাক্রান্ত মন তখন একটু শান্তির সন্ধান করে। যুগে যুগে অবতার পুরুষরা আবির্ভূত হয়ে সেই শান্তির হদিশও দিয়ে গিয়েছেন। সাম্প্রতিককালেও আমাদের মতো আহত-তাড়িত বিক্ষিপ্ত গৃহীজনদের জন্য রয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃতবাণী। স্বামী ভূতেশানন্দের কথায়— 'জগতের আদিকাল থেকে আরম্ভ করে বর্তমানকাল পর্যন্ত মানুষের যত সমস্যা উপস্থিত হয়েছে, তার এত সুষ্ঠু, এত সহজ সমাধান আর কোথাও পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ।"

আমাদের সংসারী মানুষদের বিষয়কর্ম করতে হয়। আর তা করতে গিয়ে অনেক সময়ই অশান্তি হয়, অনেক ভাবনা-চিন্তা জোটে। চিল ও মাছের গল্পের উদাহরণ দিয়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, যতক্ষণ মাছ অর্থাৎ বিষয়-কর্ম বা বাসনা থাকবে ততক্ষণ অশান্তিও থাকবে। মাছটা ফেলে দেওয়ার পরই কাকগুলোর হাত থেকে চিল রেহাই পেয়েছিল। কিন্তু বিষয়-বাসনা তো সহজে যাওয়ার নয়। তাই ঈশ্বরের দিকে মোড় ফিরিয়ে দেওয়ার কথা ঠাকুর বলেছেন। কেননা মানুষ এই মোড় ফিরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা ধরে। ঠাকুর বলছেন, 'মানুষ কি কম গা? মানুষ ঈশ্বরচিন্তা করতে পারে।' শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, ঈশ্বরলাভই জীবনের লক্ষ্য। প্রশ্ন হলো, আমাদের কাছে ঈশ্বরের মূল্য কীসে? আমাদের আনন্দবোধে। ঈশ্বরবোধ নিয়ে আমরা এত আনন্দিত বলেই তিনি আমাদের কাছে এত মূল্যবান। জাগতিক

প্রাপ্তি কিছু নেই, তবু বিশ্বজুড়ে ঈশ্বরের জন্য প্রার্থনা, পূজার্চনা। পথের ক্লান্তি সহ্য করেও দেবদর্শনে যাত্রা করে। আনন্দ পায় বলেই মানুষ করে। তাঁর কথামৃত সেই আনন্দ প্রাপ্তিরই পথনির্দেশ। তবে এই আনন্দবোধের জন্য, ঈশ্বরবোধের জন্য, 'অহংকার'-এর বাধাটিকে অতিক্রম করতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের সেই মুশকিলের আসান করার জন্য বলেছেন— একান্ত যদি 'আমি' (অহংকার) যাবে না, তবে থাক শালা 'দাস আমি' হয়ে।

ঠাকুরের উপদেশ— 'বিশ্বাস করো— মাকালী সব করবেন। যে ঠিক রাজার বেটা, সে মুসোহারা পায়।' 'বিশ্বাস হলেই সব হয়ে গেল।' এজন্য লাগে শুধু মন। তাঁকে একটু ভালবাসার মন। ভাবগ্রাহী জনার্দন মন দেখেন। যেমন ভাব, তেমনি লাভ। মন নিয়েই সব। মন ধোপা ঘরের কাপড়, যে রঙে চোবাবে— সেই রঙ হয়ে যায়। আমাদের মতো সংসারী মানুষের জন্য ঠাকুরের চিরস্থায়ী পরিত্রাণের মন্ত্র— 'তোমরা সংসার করো অনাসক্ত হয়ে। সব কাজ করবে কিন্তু মন ঈশ্বরেতে রাখবে। বড় মানুষের বাড়ির দাসী সব কাজ কচ্ছে, কিন্তু দেশে নিজের বাড়ির দিকে মন পড়ে আছে।' কিন্তু এসব জেনেও যে তা পারি না তার কারণ কামিনী-কাঞ্চন--- নারীদেহ আর অর্থ। কামিনী-কাঞ্চন ঈশ্বর চেতনা জাগরণের ক্ষেত্রে বড় বাধা। কামিনী-কাঞ্চন সম্পর্কে ঠাকুরের বিরূপ উক্তি ছড়িয়ে আছে 'কথামৃত' জুড়ে। কেননা ঠাকুরের আন্তরিক অভিপ্রায় ছিল— আমাদের চেতনার জাগরণ। এই কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তিজনিত অসহায়তা প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন— কামিনী-কাঞ্চন একপ্রকার মদ। মদ খেলে খুড়ো-জেঠা বোধ থাকে না। তাদেরই বলে কেনে 'তোর গুষ্ঠির'। কিন্তু কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ কথাটির শুধু শব্দার্থ নয়, ভাবার্থও বুঝতে হবে। কেননা নারী ঠাকুরের জীবনকে স্পর্শ করেছে গভীরভাবে— জননী চন্দ্রমণি, ধনী কামারিনী, রানি রাসমণি, ভৈরবী ব্রাহ্মণী, সহধর্মিণী সারদামণি, সর্বোপরি তাঁর আরাধ্যাও নারীমূর্তি—মা ভবতারিণী। নারীজাতির প্রতি ঠাকুরের ছিল অসাধারণ শ্রদ্ধা। এভাবে আমাদের মতো সংসারীদের প্রতি ব্যক্ত করেছেন তাঁর আন্তরিক সহানুভূতি। হয়ে উঠেছেন আমাদের 'মনের বন্ধু শ্রীরামকৃষ্ণ।'

লেখক শ্রী চিন্ময় সেনগুপ্ত আমাদের জীবনচর্চা ও চর্যার ক্ষেত্রে যেসব সমস্যার মুখোমুখি হই, তার সমাধানে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে ব্যবহারিক পথনির্দেশ দিয়েছেন তা অত্যন্ত যুক্তিসিদ্ধ ভাবে আলোচনা করেছেন এবং সেই সূত্রে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত প্রাসঙ্গিক কবিতার পংক্তিগুলি উল্লেখ করে গ্রন্থটিকে রসগ্রাহীও করে তুলেছেন। এজন্য তিনি সাধুবাদযোগ্য। গ্রন্থটির বহুল প্রচার কাম্য।

মনের বন্ধু শ্রীরামকৃষ্ণ। লেখক : চিন্ময় সেনগুপ্ত। প্রকাশক : এশিয়ান পাবলিকেশন। মূল্য : ২০০.০০ টাকা।

সা প্তা হি ক রা শি ফ ল

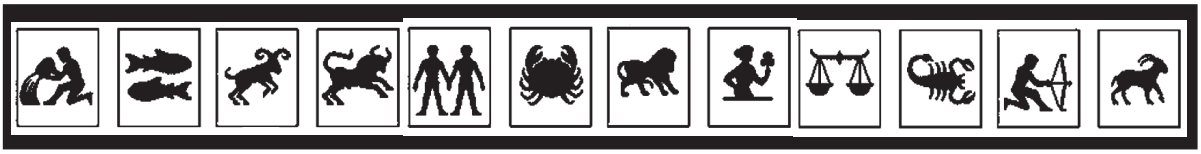

১৩ আগস্ট (সোমবার) থেকে ১৯ আগস্ট (রবিবার) ২০১৮। সপ্তাহের প্রারম্ভে কর্কটে রবি-বুধ-রাহু। কন্যায় শুক্র, তুলায় বৃহস্পতি, ধনুতে বক্রী শনি, মকরে বক্রী মঙ্গল-কেতু। শুক্রবার সকাল ১০টায় রবির সিংহে প্রবেশ। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র সিংহে পূর্ব ফাল্গুনী থেকে বৃশ্চিকে অনুরাধা নক্ষত্রে।

মেষ : বিদ্বান, পুত্রবান, ধার্মিকের ব্যবসায় উন্নতি। যশ-খ্যাতি ও বিদেশ ভ্রমণ। শিক্ষার্থীর জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি ও সঠিক মূল্যায়ন। শিল্পী ও সৌন্দর্য পিপাসুদের সৃষ্টিশীলতায় অভীষ্ট সিদ্ধি ও মান্যতা প্রাপ্তি। সহোদর ভ্রাতা অথবা ভাইপো কোনও সমস্যার কারণ হতে পারে।

বৃষ : ধর্মীয় ও সাত্ত্বিক চিন্তায় ভরপুর মন। আমদানি-রপ্তানি ব্যবস্যায় অনকুল সপ্তাহ। বিদ্যার্থীর জ্ঞানার্জনে সাবলীল অগ্রগতি। জমি-সম্পত্তি থেকে আত্মিক লাভের ক্ষেত্রে শুভ।

মিথুন : শিল্পী কলাকুশলীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি ও রমণীর প্রতি দুর্বলতা। পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্তি। লাইফ পার্টনারের সম্মান ও প্রবাসীর আগমন। প্রতিবেশী বা অধস্তন কর্মচারীর কূট-কৌশলে মানসিক বিভ্রান্তি।

কর্কট : চিন্তা-ভাবনায় দোদুল্যমানতা পরিহার করুন। সতর্ক না হলে ব্যবসায় ক্ষতির সম্ভাবনা। গৃহের পরিবেশ ও পিতার স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতন থাকুন। বেকারদের কর্মলাভ ও পেশাদারদের দক্ষতা বৃদ্ধি। অন্ত্যজ শ্রেণীর সহায়তা।

সিংহ : জ্ঞান-পাণ্ডিত্য-দৃঢ় প্রত্যয়ে জগতের আনন্দযজ্ঞে যোগদান। সমাজ-প্রগতিমূলক কাজ ও প্রযুক্তি বিদ্যায় সদিচ্ছার পূর্তি। গুরুজনের স্বাস্থ্যোন্নতি ও সন্তানের লেখাপড়ায় কাঙ্ক্ষিত ফললাভ। খনিজ ও তরল ব্যবসায় প্রাপ্তি যোগ শুভ।

কন্যা : সংগীত-বাদ্য ও দূরদর্শনের কলাকুশলীদের সজীব ও সাবলীল পদচারণা। বিলাসদ্রব্য-বাহন ও তীর্থভ্রমণের যোগ। প্রাতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সফল মনস্কাম। ঝুলে থাকা সমস্যার সমাধান। শেয়ার, ব্রোকার, রিপ্রেজেন্টেটিভদের পার্থিব সুখ।

তুলা : উদ্যম, উদারতা, শৌখিনতা, উন্নতরুচি, সদ্ব্যবহার ও চিন্তা চেতনায় কাঙ্ক্ষিত ফললাভ। সন্তানের মানসিকতায় আধুনিকতার পরশ। নতুন ব্যবসায়িক মনোভাবের বাস্তবায়ন। প্রেমের পূর্ণতায় হতাশার সংযোজন। উঁচুস্থান থেকে পতন ও পেটের অসুখে ভোগার সম্ভাবনা।

বৃশ্চিক : কর্মক্ষেত্রে অনুকুল পরিবেশ, আধিপত্য ও দায়িত্ব বৃদ্ধি। অগ্রজ ভ্রাতার শরীরের যত্নের প্রয়োজন। সন্তানের মেধার স্বীকৃতি ও গুণীজনের সান্নিধ্যলাভ। দেব-দ্বিজে ভক্তি-ঐশ্বরিক বিশ্বাসে ভালো কাজে সক্রিয়তা।

ধনু : পারিবারিক পরিবেশ ও স্বজন সম্পর্কের উন্নতিতে মানসিক প্রশান্তি। সাহিত্য প্রতিভা, শাস্ত্রীয় জ্ঞানার্জনে পূর্ণতা পাবে। বেকারদের কর্মসংস্থান, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়ের সুযোগ। পরিবারে আর্থিক প্রাবল্য বজায় থাকবে। সপ্তাহের প্রান্তভাগে প্রত্যাশাকে ছাপিয়ে যাবে প্রাপ্তির ঐশ্বর্য্য।

মকর : বাড়ি, গাড়ি, বৈষয়িক সমৃদ্ধি, বিত্ত ও আভিজাত্য গৌরব, চিন্তার স্বচ্ছতা, আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য লাভ। এই আঙ্গিকে ভাগ্যের গতি বিস্তার। কর্মে পরিবর্তন অথবা নতুন কর্মলাভের সম্ভাবনা। পিতৃদত্ত সম্পদ থেকে আয়ের শুভ যোগ।

কুম্ভ : সমাজ প্রগতিমূলক কাজে অগ্রণী ভূমিকা। বিদ্বান সন্তানের দিগ্‌ভ্রান্ত চাল-চলনে মানসিক অস্থিরতা। রমণীর সান্নিধ্যে হতাশা, সময়ের অপচয়, কর্মসূত্রে প্রবাস।

মীন : গৃহ সংস্কার, পিতৃ সম্পত্তি বিষয়ে বিড়ম্বনা। সংযম ও বুদ্ধিমত্তায় পরিস্থিতি মোকাবিলা করুন, আত্মীয় দ্বারা উপকৃত হলেও মিত্রস্থান হিতকারী নয়। লাইফ পার্টনারের সরকারি সম্মান যোগ। বিলাস সামগ্রী, স্টেশনারি, বস্ত্র, ওষুধ ব্যবসায় শুভ।

• জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।

—শ্রী আচার্য্য